Vol. 1 | Issue 1 | 2019

## Editorial Board Members

**Anulekha De**
**Anupam Gorai**
**Chaitrali Sengupta**
**Debasmita Maiti**
**Gurudas Ghosh**
**Rahul Bandyopadhyay**
**Rakesh Das**
**Sadhana Tiwari**
and
**Sunish Deb**



*We are delighted to acknowledge the unstinting encouragement and support from —*

**Samit Kr. Ray**, Director
**Anjan Barman**, Senior Professor and Associate Dean (Faculty)
**Swarnali Hait**, Junior Research Fellow
and
**Siddhartha Dutta**, Proofreader

*The Editorial Board is thankful to —*

**Shohini Majumder**
Registrar

**Nibedita Konar**
Deputy Registrar (Academic)

**Debasish Bhattacharya**
Deputy Registrar (Administration)

**Shiladitya Chatterjee**
Deputy Registrar (Finance)

**Santosh Kr. Singh**
Assistant Registrar (Purchase)

and

***Muktangan,*** Bose Centre Recreation Club

*A Student-Staff Initiative*
Published by:
The Literary Arts Group of ***Muktangan***,
**S. N. Bose National Centre for Basic Sciences,**
Block-JD, Sector-III, Saltlake, Kolkata-700106


**You may share your feedback through**

# সূচিপত্র / सूची / Contents

**সম্পাদকীয় / संपादकीय / Editorial** • 3

**প্রবন্ধ / রম্য রচনা / लेख / Article**

বিজ্ঞানের সংকট — সত্যেন্দ্রনাথ বসু • 5

সংবাদ দূষণ — শুভ্রাংশু শেখর মান্না • 9

হাইলি ওপিনিয়নেটেড — বিপ্লব ভট্টাচার্য্য • 11

ঘটির হাইকোর্ট দর্শন — শুভদীপ চক্রবর্তী • 13

**গল্প / कहानी / Story**

থেমে যাওয়া সময় — গুরুদাস ঘোষ • 16

প্যারালাল ইউনিভার্স — বিপ্লব ভট্টাচার্য্য • 20

যাযাবর মধ্যাহ্ন — সেখ ইমাদুল ইসলাম • 21

ত্রয়ী — অভিষেক রায় • 23

सपनें — साधना तिवारी • 29

**কবিতা / कविता / Poem**

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে — বিষ্ণু দে • 31

On the Seventieth Birthday of Satyendra Nath Bose — Bishnu Dey (Trans. Sunish Deb) • 31

সত্যি ও বিস্ফোরণ — সঞ্চারী গোস্বামী • 32

স্রোত — বিপ্লব ভট্টাচার্য্য • 32

ছায়ালোক — চৈত্রালি সেনগুপ্ত • 33

সমুদ্র — সুচেতা মন্ডল • 34

বিশুদ্ধ এক গানের জন্য — অঞ্জন বর্মন • 34

নির্জনলিপি — অঞ্জন বর্মন • 35

শিরোনামহীন — ইজাজ তারিফ • 35

নিয়তি — ইজাজ তারিফ • 36

এত আঘাত দিও না, প্রিয় — সুনীশ দেব • 36

মন-কেমন — কৌস্তুভ দত্ত • 36

আনমোল মতি — সহিদুল ইসলাম বিশ্বাস • 37

এই তো জীবন — সহিদুল ইসলাম বিশ্বাস • 37

আঁধার — নির্মাণ গাঙ্গুলি • 38

প্রয়াস — নির্মাণ গাঙ্গুলি • 38

আশীর্বাদী পথ — ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী • 38
এই সময় — অর্ণব শীল • 39
গর্বহীন উত্তর — অর্ণব শীল • 39
জীবনের হিসাব — অমৃত কুমার মণ্ডল • 40
(ভালো) বাসা — কেশব কর্মকার • 41
একটি গাছের আত্মকথা — অরুণাভ আদক • 42
গজু ও তার রাগ — অরিন্দম দাস • 44
बेटियाँ — अंकिता रोजरिया • 45
A Tale of Lost Times — Hrishit Banerjee • 46
Walking on, Perhaps Alone — Sunish Deb • 46
Where the Life Begins to End — Sk Saniur Rahaman • 47
Momentarily — Sk Saniur Rahaman • 47

**ভ্রমণকাহিনি / यात्रा / Travelogue**

ডুয়ার্সের ডায়েরি — অনুলেখা দে • 48
কফির দেশে দুদিন — এক অজানা যাত্রীর ডায়েরি • 51
মারখা উপত্যকায় পদযাত্রা — গুরুদাস ঘোষ • 53

**বিবিধ / विविध / Miscellaneous**

Sports Activities in the Centre • 63
Cultural Activities in the Centre • 65
Paintings, Drawings and Photographs • 67
Crossword — Rupam Porel • 75

---

**Cover Painting** — Susmita Dey
**Cover Illustration** — Rahul Bandyopadhyay
**Back Cover Theme** — *Fireflies* — Subhamita Sengupta

---

**মুদ্রণ** — শৈলী প্রেস প্রাঃ লিঃ, saileepress@yahoo.com

# সম্পাদকীয়

বাংলা তথা ভারতের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিতে ১৯৮৬ সালে গড়ে উঠেছিল 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রাষ্ট্রীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র'। বিগত ৩২ বছরে বিকশিত হয়েছে কেন্দ্রের ক্যাম্পাস, উন্নত হয়েছে গবেষণার পরিকাঠামো, বৃদ্ধি পেয়েছে গবেষণার পরিধি ও সদস্যসংখ্যা। গবেষক এবং শিক্ষকদের কলমে লেখা হয়েছে অনেক প্রবন্ধ, যা প্রকাশিত হয়েছে দেশ-বিদেশের নামি গবেষণাপত্রে। বলা বাহুল্য, সে-সব রচনা ছিল মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক। সৃজনশীলতা মানুষের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে শুরু করে স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য—সব কিছুর মূলেই রয়েছে সৃজনশীলতা। সৃজনশীলতার কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হয় না। সে নিজেই খুঁজে নেয় তার পথ। সেইজন্যই হয়তো আমরা দেখতে পেয়েছি প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে বেহালা, এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এসরাজ বাজাতে। সেদিক থেকে দেখলে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সৃজনশীলতার এক ভিন্ন মাত্রার প্রতিফলন।

কেন্দ্রে পঠন-পাঠন ছাড়াও সৃজনশীল নানা কর্মকাণ্ডের জন্য গড়ে উঠেছে 'মুক্তাঙ্গন'। মুক্তাঙ্গনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা এবং সমাজসেবামূলক কাজ। তবুও, *সাইপিক্স (Scipix)* এর কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া ইতিপূর্বে সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের আন্তরিক আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই বড়ো আকারে এবং বহুভাষায় সংকলিত এই পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার পথ করে দিয়েছে এই *সূত্র*। সংস্কৃতিমনস্ক সকল সদস্যকে বেঁধেছে এক সূত্রে। বর্তমানকালে বৈদ্যুতিন তথ্য পরিষেবার যুগে জ্ঞান আহরণের উপায় এবং মাধ্যম বিস্তৃত হলেও ভাষার ব্যবহারে অনেক সময়ে দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যবোধ যেকোনো লেখাকেই করে তুলতে পারে আরও সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য। লেখক-পাঠক নির্বিশেষে, ভাষাকে জানতে, তার মাধুর্যকে অনুভব করতে একটি সাহিত্য পত্রিকার অবদান অতুলনীয়।

সম্প্রতি কেন্দ্রে মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সর্বজনবিদিত। *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁরই নামাঙ্কিত কেন্দ্রের সদস্যদের কলমে সাহিত্যচর্চার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

# संपादकीय

यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि, सत्येन्द्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। महान भौतिक विज्ञानी, प्रो. सत्येंद्र  नाथ बसु के कार्यों को समर्पित, वर्ष 1986 में स्थापित यह संस्थान शोध का प्रमुख केंन्द्र रहा है तथा समूचे विश्व के साथ कदमताल करते हुए अधुनातन तकनीकी का उपयोग कर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। शोध संस्थान होने के कारण यहाँ विज्ञान से संबन्धित वैज्ञानिक रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं।

शोध के अलावा केंद्र के सदस्यों की सृजनशीलता कई अन्य क्षेत्रों में भी परिलक्षित होती है। केंद्र में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। किन्तु साहित्य के क्षेत्र में रचनाओं का प्रकाशन कम ही होता है। साहित्य मन के भावों का रचनात्मक प्रकाशन होता है। मन के भाव जब शब्दों के रूप ग्रहण कर कागज पर बिखरते



Contents

है तो पाठक के मन में लेखक के भावों का सहज ही चित्र खीच देते है। पत्रिका के इस अंक में केंद्र के सदस्यों द्वारा रचित कविता, कहानी तथा अन्य रचनाओं एवं कृतियों का प्रकाशन किया गया है। इस पत्रिका के द्वारा सृजनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

आशा है भविष्य में यह पत्रिका केंद्र के सदस्यों के बहुमुखी प्रतिभा के प्रकाशन का माध्यम बनेगी तथा अनवरत रूप से सबके सहयोग के साथ इसका प्रकाशन जारी रहेगा।

## Editorial

A new magazine is born, and the Bose 125 Celebrations perhaps spur the moment.

The news of bringing out a *new magazine* is not new in the state. The youthful budding talents every now and then board the *Tradition Train* from stations, rural or urban, throughout Bengal. The *LitMag* tables witness these *new-borns* riverine ripples lapping the shores of Book Fairs held horizontally.

Few words to reflect upon the *Tradition Train* :

Bose himself was one among the aspiring literati who founded the famous magazine *Parichay* in 1931 and the very first issue contained his historical article 'Bijnaner Sankat', 'The Crisis of Science'. Now, what was the spur for Bose and his fellow-founders to venture for *Parichay*? They were: *Tattwabodhinee* (1843) (eds. Akshay Kumar Dutta, Debendra Nath Tagore *et cetera*) and *Bangadarshan* (1872) (eds. Bankimchandra Chattopadhyay, Rabindranath Tagore and others) and the like. The bogies glow with stars like *Bharati, Prabasi, Sabuj Patra, Dhumketu, Narayan, Kallol, Shanibarer Chithi* and so on.

Not that we aspire for such stars! But we borrow the spirit that tinged Bose to engage himself in literary and musical expressions. So are we as *Boseians* rejoicing in the festival of creativities — mostly in science, and leisurely in art and literature. We humbly bear Bose's banner.

Thus, we whistle and set off with the hope to keep on going. The very first issue of our magazine *Sutra* contains the spirit of spontaneity allowing talents, both budding and mature. The editorial board wisely kept the sword in the scabbard, and barring the essential edits, thoroughly enjoyed the festive enthusiasm.

Here are our offerings, and the rest remains for *reader response.*



**Contents**

প্রবন্ধ | রম্য রচনা | লেখ | Article

# বিজ্ঞানের সংকট

**সত্যেন্দ্রনাথ বসু**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয়ে অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্পে বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হতে পারে, এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ-বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায়, সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম কানুন যে জড়-পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কি-না, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের গ্রহ তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু'বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা জড়-পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করবার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণিদেহের উপাদানসমূহ সবই ওই আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ-স্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরী করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে-সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানবচক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে-সমস্ত জিনিষ তৈরি করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃ সংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যতঃ কঠিন তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ু-স্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে-নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কি-না। রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদিবস্তু আবিষ্কার

করেছেন, সে কথা আমি আগেই বলেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই বিরানব্বইটি আদিবস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেক্ট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকম জড়পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদি ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আদিবস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ঐ দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজনে ও সংমিশ্রণে যতরকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন-মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমান গ্রহরাশির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভিতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেক্ট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎসমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদিবস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু-গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেক্ট্রন-সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর অণুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেক্ট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, এবং এই গঠন-প্রণালীর ফলে যে আদিবস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেক্ট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকেরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এস্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যতঃ ঘন-কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য বাহ্যাবস্থার কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতু-যষ্টির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই: অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে। সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশঃ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু-অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটানো যায় কি-না, সে বিষয়েরও আলোচনা শুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান যে রকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগানো গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সে নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড়বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্য সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড়পদার্থ। জড়পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অবস্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ প্রয়োজন নয়, সাধারণ কয়েকটির আচরণ আমরা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপ-বিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্ম-মৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণতঃ নির্ভর করে সে দেশের জল-বায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতি-বিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের মতো অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূলজড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রথমে ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মই ওই রকম অনতিক্রমণীয় ও অটল হবে! কিন্তু উত্তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে সে নিশ্চয়তা যে খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা

থেকেই বোঝা যাবে। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকেরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড় জগৎকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি-ধর্ম থেকে যে-সব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে, উপনীত হচ্ছেন, সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়মরূপেই সেগুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা পরে আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশ-ক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতিক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরও ছোট প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রনের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গবিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে একটা বিচ্ছেদহীন, অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোট-বড় নানা রকমের ঢেউ উঠতে পারে, এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউয়ের স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে একস্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথার-তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা নীহারিকা হতে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে-সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার-পথে আনীত সূর্যের কিরণরাজি। আলোক-তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলা-খেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি, তা নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গণিতকারেরা গতি-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের [জ্যোতিঃশাস্ত্রের] সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতি-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের [জ্যোতিঃশাস্ত্রের] সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলেনি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী—নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেইজন্যেই তাঁরা পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতো ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়মমাত্রেই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশঃ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেক্‌ট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোক-বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়সংকটে এসে পড়লেন। অন্যক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যেসব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন, আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট

হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোক তরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum Theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটি বলতে গেলে ব্যাপারটি এই :

যদিও আলোক-বিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোক-তরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি এই ভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হয়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোক-কণাবাদে উপস্থিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই Quantum Theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে; এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেক্ট্রন যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড়পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জন করে এক একটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নিলস্ বর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সহিত পূর্বযুগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হবে।

আলোক-বিজ্ঞানের উভয়সংকটের কথা মুখ্যতঃ এই: আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে; এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে, আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই এ ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি; তার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। ইলেক্ট্রনকে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা করে আসছিলাম, তবু টমসন-গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, সময়-বিশেষে ইলেক্ট্রনের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময়-বিশেষে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেক্ট্রনের স্রোত অনেক সময়ে সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানে একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মতো কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন অত্যল্পায়তন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা যাচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউসমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময়ে সেটি ঠিক জড়ের মতো কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারত খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে-বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়-নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ, এই মাপজোখের উপরেই গতি-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন সেগুলিকে মাপজোখ করি তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা হল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায় নিত্য নতুন আবিষ্কারের লালসায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে।

---

লেখাটি *পরিচয়* পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৮/আগস্ট ১৯৩১) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *পরিচয়*-এর বিশেষ সংখ্যায় (পৌষ ১৩৭০/জানুয়ারি ১৯৬৪) প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান নিয়ে এই প্রথম বাংলা রচনাটি আমরা নিয়েছি *পরিচয়*, বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮-৯ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০/মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে। এখানে পত্রিকায় মুদ্রিত বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

— সম্পাদকমণ্ডলী, *সূত্র*

প্রবন্ধ | রম্য রচনা | লেখ | Article

# সংবাদ দূষণ

**শুভ্রাংশু শেখর মান্না**

আমার মনে আছে ৯/১১-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ভারতের বহুল পরিচিত সাংবাদিক বীর সাংভির একটা লেখা পড়েছিলাম। তাতে উনি মিডিয়া এথিক্স নিয়ে লিখেছিলেন। বলেছিলেন যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়াতে যদিও প্রায় তিন হাজার লোক মারা গিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকান প্রিন্ট মিডিয়া একটা লোকেরও ছিন্নভিন্ন দেহের ছবি প্রকাশ করেনি। সেখানকার ইলেকট্রনিক মিডিয়া কখনো এইসব হতভাগ্য ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের কান্না বা বুকফাটা হাহাকারের ভিডিয়ো প্রকাশ করেনি। কারণটা বোঝা সহজ। এই সমস্ত দৃশ্য এবং আওয়াজ মানুষের মনকে বিপুলভাবে নাড়া দেয়। আহত করে, ক্ষতবিক্ষত করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক তো বটেই, প্রাপ্তবয়স্কদেরও এসব দৃশ্য দেখে মনের উপর গভীর চাপ পড়তে পারে; এবং পড়েও, যা একদমই বাঞ্ছনীয় নয়।

ইদানীং কালে প্রায়ই আমার এই লেখাটার কথা স্মরণ হয়। সময়টা হল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে টিভির সামনে যখন বসি। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে যে আমাদের পশ্চিম বাংলার সংবাদ চ্যানেলগুলি যেন উপরিউক্ত সংবাদ প্রচার সম্পর্কিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানে না, শোনেনি, বা বেমালুম গুলে খেয়ে ফেলেছে। ইদানীং কালে প্রতিটি সংবাদ চ্যানেলে অধিকাংশই হল অপরাধের খবর। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার দূরদূরান্তে ঘটিত অপরাধের খবর। সমস্ত ধরনের অপরাধের খবর। রানাঘাটে খুন করে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দিল, তো মালদায় কাকা ভাইপোকে মেরে ফেলল জমি নিয়ে বিবাদের জন্য। উল্টোডাঙায় বাচ্চাকে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিল তো আসানসোলে আদিবাসী মহিলার উপর সারারাত্রি ধরে নির্যাতন হল।

আমার প্রথম কথাটা হল, কেন আমি এই খবরগুলি শুনব, দেখব? কী হবে আমার জেনে? কেন আমি নিজের মনকে ভারাক্রান্ত করব? কেন এর জন্য আমার নিজের যে কাজগুলি করা কর্তব্য সেগুলি করতে অসুবিধে হবে? কেন আমাকে দু-চারটি ভালো খবর দেখার জন্য বাকি সব অপরাধের খবর বসে বসে গিলতে হবে? আমি সাংবাদিকদের বলতে শুনেছি যে সংবাদ জোগাড় করা এবং তা পাবলিকের কাছে পরিবেশন করা নাকি তাঁদের পরম কর্তব্য, তাঁদের এই কাজে কেউ নাকি বাধা দিতে পারে না। এসব অধিকার নাকি তাঁদের আমাদের দেশের আইনই দিয়েছে। ধরে নিলাম, সেসব ঠিক কথা। তবুও বলি, এসব নেগেটিভ নিউজ পরিবেশন করে সমাজের কী মঙ্গলটা তাঁরা করছেন? আমার মতে মঙ্গল তো নয়ই, বিশাল অমঙ্গল ডেকে আনছেন সমাজের। বহু মানুষ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে রয়েছে। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি, এবং সমাজে লজ্জার ভয়ে মানুষ এই দূরত্বগুলি বজায় রাখছে। উল্টোদিকে মানুষের মধ্যেকার লোভ, প্রতিহিংসার স্পৃহা ইত্যাদি এই মানুষকে সমস্ত অপরাধ করার জন্য ইন্ধন জোগাচ্ছে। এই দুই বিপরীত টানের মধ্যে পড়ে মানুষ যেন, পদার্থবিদ্যার ভাষায়, এক ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেইন করছে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। হাজার টাকা রাস্তায় পড়ে থাকলে ধরা যাক একজন নিম্নবিত্তের লোক কুড়িয়ে নিতে পারেন। দশ হাজার টাকা কুড়িয়ে পেলে আর একটু বিত্তশীল লোকও পকেটস্থ করবেন। লক্ষ টাকার বান্ডিলের দেখা পেলে, সত্যি বলতে কী, আমার আপনার মতো অনেকেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেটা বলতে চাইছি, সেটা হল সমাজে লক্ষ লক্ষ মানুষ অপরাধ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে রয়েছে। কল্পনা করা যেতে পারে যেন এই দূরত্ব প্রায় কন্টিনুয়াসলি ডিস্ট্রিবিউটেড। ফলে টিভির মাধ্যমে পাশের বাড়ি, বা তার পাশের বাড়িতে যে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিনের পর দিন দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে কেউ কেউ সেই দূরত্ব টপকে অপরাধ করে ফেলছে। এর সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি হতে বছরের পর বছর বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগা এই অপরাধ প্রবণতাকে আরও বেশি ইন্ধন জোগায়। ফলে অপরাধ করা সম্বন্ধে মানুষের ভয় আরও কমে যাচ্ছে। 'আভি তো জিন্দেগি জি লে, উস্কে বাদ জো হোগা দিখা জায়েগা' টাইপের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আরও বেশি করে অপরাধের ঘটনা ঘটছে।

তবে কী উপায়? কী করা যায় তাহলে? অপরাধের খবর কি পুরো বাদ দিতে হবে? না, এখুনি তা বলছি না। সাধারণভাবে বললে, কোনো অপরাধের খবর যদি দিতেই হয় তাহলে দেওয়ার আগে দেখতে হবে এই ধরনের খবরে দেশের জনগণের কোনো

ভালো হচ্ছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে এ.টি.এম. স্ক্যাম সম্বন্ধে জানা জরুরি, তাতে সাধারণ লোক সাবধান হতে পারবেন। কিন্তু পারিবারিক, ব্যাবসায়িক বা এইরকম সমস্যা সম্পর্কিত অপরাধ হয় পুরোপুরি টেলিকাস্ট করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত বা কেবল রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে দেখানো উচিত। অথবা এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেখানে কোনো বিশেষ চ্যানেলে এইসব খবর প্রচারিত হবে, এবং ওই চ্যানেল দেখতে গেলে স্পেশাল সাবস্ক্রিপশন দিতে হবে।

আর একটা দিকও আছে। আজকাল প্রতিটা খেলা, প্রতিটি চটকদারি ইভেন্টকে টেলিকাস্ট করবার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলকে বিশাল টাকা দিয়ে ট্রান্সমিশন রাইট কিনতে হয়। আজকাল হাই লেভেল সেলিব্রিটিদের বিয়েও প্রায় মাসখানেক ধরে হচ্ছে, তার একটা কারণ হল বিয়ের ছবি ও ভিডিয়ো বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও টিভি সংস্থা বিপুল টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। আরও আছে। ফেসবুক ব্যবহার করতে গেলে কিছু বিজ্ঞাপন আপনাকে দেখতে হবেই। ফেসবুক ব্যবহার করে যে সুবিধে আপনি নিচ্ছেন, তার বদলে ওই বিজ্ঞাপনগুলো আপনাকে দেখিয়ে ফেসবুক পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে গরিব সাধারণ মানুষের বাড়িতে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তার খবর প্রচার করে টিভি চ্যানেল পয়সা কামাবে, তবে সেই বাড়ির লোক পয়সা পাবে না কেন? যদি অপরাধের খবরেরও রয়্যালটি-র নিয়ম চালু হয় তাহলে হয়তো অপরাধের খবর দেখানো কিছুটা হলেও কমতে পারে। বড়ো কোনো নেতা ব্যক্তি বা সেলেব্রিটি মারা গেলে সারাদিন ধরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব কিছুর ডিটেইলস টিভিতে দেখানো হয়, ভালো / মন্দ / মশলাদার সব ধরনের বিজ্ঞাপন সমেত, ফলে টিভি চ্যানেলগুলি আকাশ ছোঁয়া টি আর পি এনজয় করে। তাহলে যিনি মারা গেলেন, তাঁদের পরিবারেরও কিছু রয়্যালটি পাওয়া উচিত। এখন কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও আমার প্রেডিকশন হল সেই দিন আর বেশি দূরে নেই।

আসল কথা হল, সত্যিই কি আমাদের সব সংবাদ সব সময় জানা দরকার? নেগেটিভ নিউজ আপনাকে খারাপ কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে, পজিটিভ নিউজ আপনাকে ভালো কাজে উৎসাহিত করবে। উচিত হবে, যদি দেখাতেই হয়, সমস্ত নেগেটিভ নিউজ কোনো বিশেষ সময়ে দেখিয়ে বাকি সময় জীবনমুখী ভালো সংবাদ বিতরণ করা। এই সংবাদ দূষণ থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে। এটাই এখনকার নিড অফ দি আওয়ার।

The destitute smile — Anwesha Chakraborty

প্রবন্ধ | রম্য রচনা | লেখ | Article

# হাইলি ওপিনিয়নেটেড

## বিপ্লব ভট্টাচার্য্য

একটু বাজার গেছিলাম, বরফঢাকা শক্ত নোনা মাছ আর আড়তপচা সবজি হেব্বি সস্তায় পেয়েছি, জমিয়ে ভুরিভোজ হবে আজ। না এর চেয়ে দামি আর তো কিছু দেখলাম না বাজারে, লোকজনের ওপিনিয়ন ছাড়া। হ্যাঁ ওই তো রেডিয়ো চালিয়ে তাসের বান্ডিল নিয়ে বসে যারা একহাতে মাছি মারছে আর আরেক হাতে পাছা চুলকোচ্ছে, তাদের জন্য নাকি বাজারে নতুন কীসব আসছে। কে যেন বলছিল দুজনের সংসারে এমনিতেই খাওয়া জোটে না, এরপর আবার নেশা করে বউয়ের গায়ে হাতও তোলা যাবে না। বাইচান্স যদি কান্নাকাটি করে ফ্যালে অমনি দুজন থেকে তিনজন থেকে চারজন এভাবে বাড়তে থাকবে সংসার। পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেটুকু বুঝলাম, ওরা যারা সংসারের জন্য গোরুর মতো খাটছে তাদের জন্য বিফ-ব্যান-এর মতো সুখবর আছে। তাই আমাদের মতো ছাগলদেরও একটা প্রশ্ন আছে, কোন কোর্টে এফিডেভিট করে ছাগল থেকে গোরু হওয়া যায়, যদি একটু বলতে পারেন খুব খুব খুব সুবিধে হয়।

উফ্, দুপুরের ভুরিভোজের পর শেষ পাতে আরেকগুচ্ছ টক-ঝাল-মিষ্টি ওপিনিয়ন হলে মন্দ হয় না। গাছের ছায়ায় দড়ির তাকিয়া ফেলে রেডিয়োটা চালাতেই ঢিঞ্চকপূজার গান শুনে মনটা জুড়িয়ে গেল। ব্যাস অমনি ঢিঞ্চকপূজার নাম শুনে তোমাদের মতো উড়নচণ্ডী জ্ঞানীগুণীরা নিশ্চয় দাঁতে আঙুল চেবাচ্ছ আর ভাবছ, কী চয়েস রে বাবু। বুক ফুলিয়ে বলতে পারি ''ইটস মাই চয়েস''। সবাই তো আর সোনু নিগম হতে পারে না, কিন্তু তা বলে কি গান গাইবে না? সুতরাং ঢিঞ্চকপূজার গান যদি কারুর সকালের অ্যালার্ম টোন কিংবা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সঙ্গী হয়, তাতে রোদ্দুর রায়ের পাকা দাড়িতে একটিও আঁচড় পড়ার কথা নয়! খামোখা তোমরা নিজেদের ভাব ধারণার বাগানে হিরো আলমের মতো সৃষ্টিশীল মানুষদের টেনে এনে তাদের ভাবমূর্তিকে হেয় করো। তুমি ঋত্বিক, সত্যজিৎ, মৃণালপ্রেমী হতে পারো, তা বলে কি কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের ভুলটা শুধরে দিয়ে নিজের ছোটোবেলার বুনিপ দেখার ইচ্ছেটা চাঁদের পাহাড়ে পূরণ করতে পারবেন না! এটা কাঁহাকার ইনসাফ। হাজার হাজার মিমিক্রি আর্টিস্টের ন্যাকামি, তোতলামি দেখে তোমরা হেসে লুটোপুটি খাবে, ইরফান আর নওয়াজুদ্দিনের অভিনয় দেখে ''ন্যাচারাল ন্যাচারাল'' বলে চিৎকার করবে, অথচ দেবের ন্যাচারাল তোতলামি তোমাদের চক্ষুশূল। এসব তো আর মেনে নেওয়া যায় না। দেশবিদেশের সমস্ত ছবি দেখার, গান শোনার অবকাশ কারই বা আছে বলো তো। প্রীতমের মিউজিক আর রাজ চক্রোত্তির মুভির যুগলবন্দি যে দেশ-কাল-সংস্কৃতির সীমানা মিটিয়ে দিচ্ছে তার জন্য একটু দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেও কি পারো না!

সেই চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে সূর্যটা ঈশানকোণে গিয়ে বসেছে, তাতে কি কেউ আপত্তি করেছে। অথচ ইংল্যান্ড-এ খেলতে গিয়ে বিরাট কোহলি অনুষ্কার সাথে ঘুরলে তোমাদের আপত্তি, তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেটারটা টেবিলে টেবিলে ঘুরলে তোমাদের আপত্তি, ভোটের চাকা ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা বাম থেকে ডাঁয়ে ঘুরলে তোমাদের আপত্তি, দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ বিভুঁই ঘুরলে তোমাদের আপত্তি, এমনকী ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এর আইকনটা ঘুরলেও তোমাদের সহ্য হয় না। ইনটলারেন্স নয়তো আর কীই বা বলা যায় শুনি। বছর ঘুরবে যখন জিও-র অফারটা শেষ হয়ে যাবে, তখন যদি তোমাদের সম্বিত ফেরে। তারপর আম্বানি প্রবাসী হলে গোলগোল চোখ করে প্রশ্ন কোরো না যে আমাদের ট্যাঁকের টাকাগুলো গেল কোথায়।

হাজার হাজার ওপিনিয়নের রমরমা তোমাদের মধ্যে। ঢাকঢোল পেটানো থেকে শুরু করে, লাঠিসোঁটা দিয়ে পেটানো অবধি কিছুই বাকি রাখছ না তোমরা তোমাদের ওপিনিয়নের প্রচারে আর প্রসারে। অথচ একটু ড্রিঙ্ক করে দেশের মাটি ছেড়ে হাওয়া কপিল শর্মা নিজের মতামত রাখলেই গোলযোগ। সোনু নিগম টুইট করলে তার ওপর চর্চা, ফতোয়া। কে.আর.কে.-এর টুইটের পর টুইটকে নিয়ে হাসিঠাট্টা, এমনকী অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে তো ব্লকই করে দেওয়া হল। কেন তোমরা *বাহুবলি টু* দেখতে ব্যস্ত বলে কি কেউ নিজেদের মতামতও রাখতে পারে না! কাটাপ্পা বাহুবলিকে কেন মারল জানার জন্য বছর খানেক অপেক্ষা করতে পারো, হাজার কোটি টাকা ঢালতে পারো, অথচ টেট-এর পরীক্ষার ফল জানতে লাখ খানেকেও আপত্তি। বলি দেশের ভবিষ্যৎ কার হাতে, শিক্ষকদের নাকি রাজমৌলীর!

নাহ্ আর পারছি না বাপু। সন্ধ্যে হয়েছে, গোরুটাকে গোয়ালের খুঁটোয় বেঁধে দুটো খড়কুটো দিয়ে আসি নাহলে আবার

কাল সকালে দুধ পাব না, শুধু জল তো আর বেচা যায় না। ভাগ্যিস গোরুগুলো লিখতে পড়তে পারে না, নাহলে গোরুগুলো হাল চষতে না চাইলে আমাদেরও আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকত না। সাক্ষরতা মিশনের আওতায় গোরুগুলো আসার আগে একটা দালানঘর, দেরাজ-ভরতি কাঁচা টাকা, দু-একটা গাড়ি, আর একটা পলিটিকাল পার্টির টিকিট কেটে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে। তোমরা থাকো তোমাদের ওপিনিয়ন নিয়ে, আমাদের তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, না কি! নসবন্দি করে সংসারে লোকসংখ্যাটা কমে গেল, এখন নোটবন্দির দৌলতে ব্যাঙ্কে লাইন দেবে কে শুনি। শ্বাসবন্দি হওয়ার আগে আরেক দিন যদি বরফঢাকা শক্ত নোনা মাছ আর আড়তপচা সবজির ভুরিভোজটা হয়ে যায় মন্দ কী।

The adolescent mind — Chandrima Banerjee



Contents

প্রবন্ধ | রম্য রচনা | লেখ | Article

# ঘটির হাইকোর্ট দর্শন

**শুভদীপ চক্রবর্তী**

ইতিহাস আমি ঘেন্না করতাম। এত বোরিং, এত পড়তে হত, এত লিখতে হত যে আমি ভাবতাম সাবজেক্টটা উঠে যাচ্ছে না কেন? মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা দিয়ে ইস্কুলের গেট থেকে বেরোচ্ছি একগাল হাসিমুখ নিয়ে। গেটের বাইরে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে মা দাঁড়িয়ে। আমায় হাসিমুখে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করল — পরীক্ষা ভালো হয়েছে নাকি?

আমি বললাম — না, হয়নি।

তাহলে এত ফুর্তি কীসের?

আর কোনোদিন ইতিহাস পড়তে হবে না।

অনেক বছর পর আজ ইতিহাসের প্রতি একটা টান অনুভব করছি। সৌজন্যে এই এস. এন. বোস সেন্টার। এখানে গবেষণার সুবাদে কয়েকবার হাইকোর্ট দর্শনের প্রসাদ লাভ হয়েছে। দাঁড়ান, এইটুকু পড়েই ঘাবড়ে যাবেন না। কেন যেতে হয়েছে সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। হাইকোর্ট ও তার আশেপাশে যে টানটান ইতিহাস রয়েছে সেটাই হল এখানে আলোচ্য বিষয়। হাইকোর্ট যাবার সময় হাইকোর্টের সামনে গাড়ি পার্কিং-এর এত ভিড় হত যে আমরা হয় হাইকোর্টের একদিকে রাজভবনে, নয়তো আরেকটু এগিয়ে সেন্ট জন'স চার্চ-এ ট্যাক্সি থেকে নেমে, হেঁটে হেঁটে হাইকোর্ট যেতাম। চার্চটির পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রতিবারই তার ভেতরটা দেখার ইচ্ছে জেগেছে। আর কয়েকবার গেট দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে একটুখানি দেখতেও পেয়েছি। কিন্তু পরে কোনোদিন যাব ভেবে শুরুর দিকে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হাইকোর্টের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে যে সেই চার্চের মধ্যেই ঢুকতে হবে সেটা কখনো ভাবিনি।

হাইকোর্টের বর্তমানে দুটো বিল্ডিং আছে, একটা নতুন সেন্টিনারি বিল্ডিং, আর একটা হল লাল রঙের পুরোনো বিল্ডিং। 'সেন্টিনারি বিল্ডিং'টি নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে আধুনিক একটা বিল্ডিং, এস্কেলেটর আছে। এদিকে, পুরোনো বিল্ডিংয়ের ফ্লোরগুলো এইসা উঁচু, ওটার একতলা মানে আমাদের সাধারণ বাড়ির প্রায় তিনতলা। এর'ম পেল্লাই সাইজের বিল্ডিং দেখে আমি তো হাঁ। ভেতরে ঢুকে বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল। তার সাথে খারাপও লাগছিল এটা ভেবে যে এই বাড়িটাই একসময় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ছিল, আর এখন ডিমোশন হয়ে হাইকোর্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, ভুল ভাঙল ফিরে এসে ইন্টারনেটে সার্চ করতে গিয়ে। ইন্টারনেটে দেখলাম, হাইকোর্টের জন্যই ১৮৬২ সালে এই বিল্ডিং নতুন করে বানানো হয়, এমন নয় যে ওখানে সুপ্রিম কোর্ট ছিল আর দুম করে তাকে হাইকোর্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে যে প্রশ্নটা রয়ে গেল সেটা হল — সুপ্রিম কোর্ট-টা কোথায় ছিল? গুগল বলল, সেটা ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। আরেব্বাস! সুপ্রিম কোর্টটা এত বিশাল ছিল? আবার ভুল ভাঙল। প্রিন্সেপ ঘাটের উল্টোদিকে যে ফোর্ট উইলিয়াম আছে সেটা নয়, সেটা নতুন ফোর্ট উইলিয়াম। সুপ্রিম কোর্ট-টা ছিল পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামে। খাইসে, সেটা আবার কোথায়? ঘেঁটে যাচ্ছে তো?

তবে একটু খোলসা করে বলি। তখন ১৬০০ সাল। কয়েকজন দুঃসাহসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ ব্যাবসাদার পূর্ব এশিয়ায় ব্যাবসা করতে আসবে বলে রানি প্রথম এলিজাবেথ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে। PRL-এর মতো সোজা রিজেক্ট! কেন? কারণ তাদের কাছে অদ্দুর ব্যাবসা করতে যাবার মতো পর্যাপ্ত মূলধন নেই। কিন্তু লোকগুলো বেশ জেদি ছিল, হাল ছাড়েনি। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় খানিকগুলো জাহাজ ও প্রায় ৭০০০ পাউন্ড মূল্যের মূলধন দেখিয়ে শেষমেষ অনুমতি আদায় করে ছেড়েছে। ব্যাস! আর দেখে কে! ঝপাং করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাভা, সুমাত্রা এখান-সেখান হয়ে তারা ভারতে ল্যান্ড করে ১৬১২ সালে, বর্তমান গুজরাতের সুরাতে। গিয়ে দেখে সেখানে আগে থেকেই পর্তুগিজরা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। কী আর করা! যুদ্ধ অনিবার্য। আর সেই যুদ্ধে পর্তুগিজরা হেরে যায়। নেক্সট টার্গেট দেশীয় রাজারা। দিল্লির সিংহাসনে তখন জাঁকিয়ে বসে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন তখনও শুরু হয়নি। এরপর ইংরেজদের যা স্বভাব আর কি, সম্রাটের কাছে প্রতিনিধি পাঠায়, সাথে একগুচ্ছ উপহার। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তেলটেল মেরে, আমার থেকে তোমার লাভ হবে বেশি — এসব বুঝিয়ে সারা ভারতে ব্যাবসা করার অনুমতি আদায় করে ফিরে আসে। পরবর্তী সম্রাট শাজাহান আবার আর এক ধাপ উপরে গিয়ে বিনা ট্যাক্সে সারা ভারতে ব্যাবসা করার অনুমতি দিয়ে বসেন। ব্যাস! তারপর ইংরেজরা একে একে ভারতের চার জায়গায়, প্রথমে সুরাত (১৬১৯), তারপর মাদ্রাজ (১৬৩৯) ও

বোম্বে (১৬৬৮) হয়ে সবশেষে কলকাতায় (১৬৯০) তাদের বিজনেস হাব বানাল। চার জায়গাতেই তাদের কারখানা গড়ে তুলল। কারখানা বলতে তুলো, রেশম, মশলা এইসবের কারখানা। জোব চার্নক অবশ্য প্রথমেই কলকাতাকে বাছেননি, বেছেছিলেন হুগলিকে। তখন অলরেডি চন্দননগরে ফরাসিদের ও চুঁচুড়াতে ডাচদের ঘাঁটি ছিল। প্রথম প্রথম ইংরেজরা যেহেতু তখনও হুগলিতে গুছিয়ে উঠতে পারেনি, তাই তখনকার নবাব শায়েস্তা খাঁ, মুঘল সম্রাটের অবাধ ব্যাবসার অনুমতি সত্ত্বেও ইংরেজদের থেকে ট্যাক্স আদায় করতে থাকেন এবং উৎপাত শুরু করেন। শায়েস্তা খাঁ-এর জ্বালায় জোব চার্নক হুগলি থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মাদ্রাজ পালান। তারপর কয়েক বছর পর আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরে আসেন নবাব ইব্রাহিম খাঁ-এর সাথে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী, ১৬৯০ সালে এই দ্বিতীয়বার পূর্বভারতে ফিরে আসার সময় তারা বর্তমান জোড়াবাগান-বড়বাজারের কাছে 'কলকাতা', তার উত্তরে বর্তমান শোভাবাজারের কাছে 'সুতানুটি' এবং 'কলকাতা'-র দক্ষিণে 'গোবিন্দপুর' (বর্তমানে ময়দান এলাকা)—এই তিনটি গ্রাম থেকে ট্যাক্স আদায় ও সেখানে ব্যাবসা করার অনুমতি পায়। হুগলি নদীর পূর্বপাড়ে এই সুতানুটি গ্রামটিকে তারা কিন্তু এমনি এমনি বাছেনি। এর পিছনে যথেষ্ট ভৌগোলিক কারণ ছিল। সুতানুটির পশ্চিমদিকে হুগলি নদী আর পূর্ব ও দক্ষিণদিকে দুর্ভেদ্য জলাভূমি ছিল। এর ফলে শত্রু আক্রমণ হলে তার একমাত্র চান্স ছিল উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। তাই শুধু উত্তর-পূর্ব দিকে কড়া পাহারা রাখলেই ওদের চলে যাবে।

এরপর তারা দেশীয় রাজাদের আক্রমণ ও ফরাসি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ইউরোপিয়ান আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের কারখানা ও অফিসকে বাঁচাতে, তাদের কারখানাগুলোকে ঘিরেই একটি দুর্গ গড়ে তোলে হুগলি নদীর ঠিক তীরেই, কলকাতা গ্রামেরই একটা অংশে। ১৭০১ সাল থেকে এই দুর্গ অর্থাৎ ফোর্ট তৈরি শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৭০৬ সালে। রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুযায়ী এই ফোর্টের নাম হয় ''ফোর্ট উইলিয়াম''। এই ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি হয়েছিল নিতান্ত দায়সারাভাবে। ওপরমহলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ফোর্টটা পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজের বদলে চারকোনা বানানো হয়, দেওয়ালগুলোও যথেষ্ট পুরু ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে অনেক কামান ও অস্ত্রশস্ত্র আনানো হলেও সেগুলো রাখা থাকত খুব অগোছালো ভাবে। কামান, বন্দুক ছোঁড়ার জন্য দেওয়ালে যে খুপরি থাকে সেগুলোও বানানো হয়েছিল অপরিকল্পিতকভাবে। এর পরিণতি যে কী হতে পারে সেটা তারা টের পেয়েছিল আরও পঞ্চাশ বছর পরে।

ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তরদিকে ইংরেজরা থাকতে শুরু করে, যা হোয়াইট টাউন নামে পরিচিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্ব দিকে তৈরি হয় কলকাতায় ব্রিটিশদের বানানো প্রথম চার্চ ''সেন্ট অ্যানি'স চার্চ''। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছিল বিরাট দিঘি। নাম ''লাল দিঘি''। এই দিঘির নাম লাল কেন সেই নিয়ে অনেক কাহিনি আছে, সেসবে এখন যাচ্ছি না। তবে এই লাল দিঘি পরবর্তী ২০০ বছর কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ করে, নাম পালটে হয় ''ডালহৌসি স্কোয়ার'' যার বর্তমান নাম বি.বা.দী. বাগ। হোয়াইট টাউনের উত্তরে সুতানুটি এবং চিৎপুরে, আর দক্ষিণে গোবিন্দপুরে ভারতীয়রা বসবাস করত যা ব্ল্যাক টাউন নামে পরিচিত হয়। আস্তে আস্তে ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের ব্যাবসা ও ট্যাক্স আদায় বেশ ফুলে ফেঁপে ওঠে, তার সাথে অল্প অল্প অত্যাচারও শুরু হয়। ব্যাপারটা দেশীয় রাজারা খুব একটা ভালোভাবে নেননি। ইংরেজদের এই বাড়বাড়ন্তের খবর পেয়ে ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করে বসেন।

১৭৫৬ সালের এই ''লাল দিঘির যুদ্ধ''-য় ইংরেজরা পরাজিত হয়। সিরাজের হাতে ধূলিসাৎ হয় হোয়াইট টাউন। সেন্ট অ্যানি'স চার্চ এমনিতেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ ছিল, তার উপর ১৭২৪ সালে একবার বাজ পড়ে সেটার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। শেষমেষ ''লাল দিঘির যুদ্ধ''তে সিরাজ বাহিনীর হাতে ফোর্ট উইলিয়াম ও সেন্ট অ্যানি'স চার্চ ধ্বংস হয়ে যায়। বেশিরভাগ ইংরেজ ও তাদের সৈন্য মাদ্রাজ ও ফলতা (বর্তমানে জনপ্রিয় পিকনিক স্পট) পালিয়ে যায়; সেই সঙ্গে ব্ল্যাক টাউন গোবিন্দপুরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। শুধু পালাতে পারেন না কর্নেল হলওয়েল ও তাঁর বাহিনীর ১৪৫ জন সৈন্য। সিরাজ তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ামেরই একটা গোডাউন ঘরে আটকে রাখেন। কর্নেল হলওয়েল পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া অ্যানুয়াল রিপোর্টে এই বন্দিদশার বিবরণ দেন। তাতে বলা হয়, একটা ১৪ ফুট বাই ৮ ফুট ঘরে ঠাসাঠাসি করে ১৪৬ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঘরটাতে একটা মাত্র গারদের দরজা ছিল, না ছিল হাওয়া, না ছিল জল। তার ওপর তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম। হলওয়েল পাহারাদারকে ২০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে বলেন সিরাজকে রাজি করাতে যাতে একটু বড়ো কোনো ঘরে বন্দি করে রাখেন। কিন্তু সেই পাহারাদার খোঁজ নিয়ে জানায় যে সিরাজ এখন ঘুমাচ্ছেন, ঘুম থেকে না উঠলে কিছু বলা যাবে না। তখন সেই পাহারাদারকে অন্তত একটু জল এনে দেবার জন্য বলেন, তো সে জল আনলে বাধে আর এক বিপত্তি। ওইটুকু জলে তেষ্টা কমার জায়গায় আরও বেড়ে যায়, আর তার সাথে জল পাবার জন্য সবাই গারদের দিকে এগিয়ে আসতে চায় এবং সেই ঠেলাঠেলিতে বেশিরভাগ জনের মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে যখন বন্দিদের খবর সিরাজের কাছে পৌঁছোয় তখন সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে তাদের বের করে আনার নির্দেশ দেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন মারা গেছে। আর বাকি ২৩ জন হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়তো ভুল বকছে। ওই ২৩ জনের মধ্যে কর্নেল হলওয়েলও ছিলেন। চিকিৎসার পর ওই ২৩ জন সুস্থ হয়ে

ওঠে ও তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতিহাসে এই হত্যা ''অন্ধকূপ হত্যা'' নামে পরিচিত। এই ঘটনার পর সিরাজ কলকাতায় নবাবি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। যাবার আগে কলকাতার নাম পাল্টে দাদু আলিবর্দি খাঁ-এর নামে 'আলিনগর' রেখে যান।

ইংরেজরা কিন্তু হেরে গিয়ে চুপ করে বসে ছিল না। ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের নেতৃত্বে তারা সিরাজকে আক্রমণ করে এবং ''পলাশীর যুদ্ধ''-য় সিরাজ পরাজিত ও নিহত হন। মিরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসিয়ে ক্লাইভ কলকাতা পুনর্দখল করেন। আলিনগর আবার কলকাতা হয়ে যায়। ক্লাইভ পুরোনো বিধ্বস্ত ফোর্ট উইলিয়ামকে পরিত্যাগ করেন ১৭৫৮ সালে ময়দানে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম বানানো শুরু করেন যা শেষ হয় ১৭৮১-তে। এই নতুন ফোর্ট উইলিয়াম হল বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর। তাহলে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের কী হল? পুরোনো ভাঙাচোরা ফোর্ট উইলিয়ামকে প্রধানত তিনটে কাজে লাগানো হয় — একটা অংশে ১৭৬৬ সালে ''কাস্টম্স্ হাউস'' বানানো হয়, আর একটা অংশে ১৭৭৪ সালে ''সুপ্রিম কোর্ট'' বানানো হয়, আর অন্য একটা অংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসার হিসেব-নিকেশ করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে যারা এসেছিল, সেই ক্লার্কদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ক্লার্কদের এই ঘরগুলো খুব ছোটো ছোটো ও অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাই ১৭৭৭ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস যেখানে সেন্ট অ্যানি'স চার্চ ছিল সেই জায়গায় অর্থাৎ লাল দিঘির উত্তরদিকে ক্লার্ক অর্থাৎ ''রাইটার''দের থাকার জন্য বেশ বড়োসড়ো খোলামেলা ঘর বানাতে নির্দেশ দেন থমাস লায়নকে। এই ''রাইটার্স বিল্ডিং'' হল কলকাতার বুকে প্রথম তিনতলা বাড়ি।

কর্নেল হলওয়েল অন্ধকূপ হত্যায় মৃতদের স্মরণে, যে জায়গায় অন্ধকূপটি ছিল, ঠিক সেই জায়গায় একটি মনুমেন্ট স্থাপন করেন। ঠিকমতো বলতে গেলে মনুমেন্টটি তৈরি হয় লাল দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে, সুপ্রিম কোর্টের ঠিক সামনে। কিন্তু ১৮২১ সালের পর সেটির আর খোঁজ পাওয়া যায় না। কী হয়েছিল তা ইতিহাসেও লেখা নেই। বেশ কয়েক দশক পর ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন ওই একই জায়গায় একইরকম আর একটি মিনার বানান। এখানে বলে রাখা ভালো যে ওই মনুমেন্টের একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। কারণ অন্ধকূপ হত্যা ছিল ভারতীয়দের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার আর ইংরেজদের কাছে ছিল নিরীহ ভারতবাসীর ওপর করা নিজেদের অত্যাচার ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাস্টিফাই করার একটা রাস্তা। যেন ভাবখানা এরকম যে দেখ, ভারতীয়রা আমাদের ওপর কত অত্যাচার করেছিল, তাই আমরাও ওদের ওপর অত্যাচার করতেই পারি। এই কারণেই এটা সুপ্রিম কোর্টের ঠিক সামনে স্থাপন করা হয়, যাতে সকলের চোখে পড়ে। এই অবস্থায় ১৯৪০ সালে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে, তখন সব স্বদেশি নেতারা একযোগে প্রকাশ্যে এই মনুমেন্ট রাখার তীব্র বিরোধিতা করেন, এমনকী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত। সেই চাপে ব্রিটিশ সরকার শেষপর্যন্ত ওই বিতর্কিত মনুমেন্টকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট সেন্ট জন'স চার্চ-এ রাখা আছে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, সেই চার্চ যেখানে ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা হেঁটে হেঁটে হাইকোর্ট যাই। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে, সবই তো হল, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট-এর সেই বিল্ডিংটা এখন কোথায়? সেটি ভেঙেচুরে গিয়ে বর্তমানে জি.পি.ও., আর.বি.আই. ইত্যাদি নানান অফিস হয়েছে।

এই ইতিহাস জানার পর কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারিনি, একদিন চলেই গেলাম সেন্ট জন'স চার্চ-এর ভেতরে। দেখে এলাম সেই বিখ্যাত ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট। এছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে ওই চার্চ-এর ভেতরে, যেমন সেই বিখ্যাত পাইপ অর্গ্যান, জোব চার্নক, লর্ড ব্রেবোর্ন, লেডি ক্যানিং ও সুপ্রিম কোর্ট-এর প্রথম প্রধান বিচারপতির সমাধি ইত্যাদি। এই পাথুরে গির্জার নিজেরও একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনি আছে। সেসব কথা পরে আরেক দিন বলব। তাছাড়া ভুলে যাবেন না, আমরা মাঝে মাঝে হাইকোর্ট যাবার সময় রাজভবনে নেমেও হেঁটে হেঁটে যেতাম। রাজভবনের ইতিহাসের কথা তো বলাই হয়নি। এই রাজভবন, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর মিরজাফর যে কীভাবে টালিনালা দিয়ে সংযুক্ত সেকথাও তখনি একসাথেই বলব।

তথ্যসূত্র :

https://puronokolkata.com/

https://www.wikipedia.org/

# থেমে যাওয়া সময়

## গুরুদাস ঘোষ

দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দুজনকে। ঘাসের গালিচায় পা ছড়িয়ে, ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল মেয়েটি। মাঝে মধ্যে ওড়না আর অবিন্যস্ত চুল ঠিক করে নিচ্ছিল সে। গাছপালায় ঘেরা নির্জন উদ্যান। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য দুর্লভ স্থান। কর্মব্যস্ত শহরের বুকে এরকম একটা পার্ক রয়েছে, সুজয়ের তা জানা ছিল না। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে প্রেমিক, পাগল আর ভবঘুরে ছাড়া গ্রীষ্মের দুপুরে পার্কে কেউ কেনই বা বেড়াতে আসবে? গাছের ছায়া, পাখির কলতান আর মৃদু বাতাসে একটা অলস নেশা ধরানো পরিবেশ। পার্কের বেঞ্চে শুয়ে খবরের কাগজটা দু-ভাঁজ করে মুখের উপর চাপা দিয়ে চোখ বোজে সুজয়।

আজ দু-সপ্তাহ হল সুজয়ের এই এক নতুন কাজ হয়েছে। অফিসের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাওয়া। শুধুই অকারণে ঘুরে বেড়ানো, তা নয়। বাড়ির কাছে বাস স্ট্যান্ড থেকে তিন-চার রকম খবরের কাগজ কিনে নেয় সে। তারপরে নিরিবিলি কোথাও বসে কর্মখালির বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে। সম্ভাব্যগুলোতে পেন দিয়ে দাগ দেয়। তারপর আবেদনপত্র আর বায়োডাটা খামে ভরে পোস্ট করে। আনুষঙ্গিক সব উপকরণ সুজয়ের ব্যাগে মজুত থাকে। কখনও সরাসরি ইন্টারভিউ দিতে চলে যায়। গত দু-সপ্তাহে প্রায় ত্রিশটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছে, পাঁচটা ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো আশার আলো দেখতে পায়নি।

সবকিছু ঠিকই চলছিল সুজয়ের জীবনে। হাওড়ার একটি এন. জি. ও-তে হিসাবরক্ষকের কাজ করত সুজয়। গত বছর বিয়েও করেছে। ছোটো সংস্থাটিতে সকলে এক সুখী পরিবারের মতোই ছিল। সংস্থাটি চলত মূলত বিদেশি অনুদানে, যার মধ্যে প্রধান ছিল ফ্রান্সের এক দাতব্য সংস্থার টাকা। সেই অনুদানের প্রতিটি টাকার হিসাব সময়মতো পাঠানোও হত ই-মেল করে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে ফ্রান্সের সংস্থাটি জানাল, তাদের পক্ষে আর অনুদান দেওয়া সম্ভব নয়। সুজয় অ্যাকাউন্টস সামলাত। তাই সহজেই বুঝেছিল, অবিলম্বে বিকল্প আয়ের পথ বার করতে না পারলে সংস্থার ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। সংস্থার কর্ণধার নিশীথরঞ্জন রায় সকলকে ডেকে জানালেন সেই দুঃসংবাদ। সেই সঙ্গে অবিলম্বে সকলকে বিকল্প কাজ খুঁজে নিতে উপদেশ দিলেন। সংস্থাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা একটা হয়েছিল। অনেক সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থার কাছে অনুদানের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে সাড়া মেলেনি। এই ঘটনার চার মাস পরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সঙ্গী করে সুজয় এবং বাকি চারজন কর্মী অফিসে যাওয়া বন্ধ করল। অফিসের দরজা খোলা-বন্ধ এবং চিঠিপত্র নেওয়ার জন্য যৎসামান্য বেতনে কাজে বহাল রইলেন বয়স্ক কর্মী মানিকদা।

সহকর্মীদের একজন তার পিসতুতো দাদার বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ শুরু করেছে। এক মহিলা সহকর্মীর বিয়ে আসন্ন। সে আপাতত চাকরির কথা ভাবছে না। বাকি দুজন সহকর্মীর অবস্থা সুজয়ের মতোই। সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু সুফল মিলছে না।

সুজয় অনেকবার ভেবেছে স্ত্রী মঞ্জরীকে সব জানাবে, কিন্তু চেষ্টা করেও বলতে পারেনি। মঞ্জরী সহজ-সরল স্বভাবের। সর্বদা হাসিখুশি থাকে। মায়ের সাথে গল্প করে। ঘর সাজায়। মাঝে মাঝে নতুন পদ রান্না করে খাওয়ায়। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য সুজয়। চাকরিটা আর নেই একথা জানার পরে আর কি আগের মতো হাসতে পারবে মঞ্জরী? আগামী পুজোর ছুটিতে সিকিম বেড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আসন্ন বেড়ানো নিয়েও মঞ্জরীর খুব উৎসাহ। সুজয়ের মনে হয়, মঞ্জরীর জীবন থেকে তার প্রাপ্য সুখটুকু কেড়ে নেওয়ার অধিকার তার নেই। ঝড়-ঝাপ্টা যা কিছু তার উপর দিয়েই যাক। সংসারের সুখের প্রদীপটুকু সে বুক দিয়ে আগলে রাখবে।

সুজয় উচ্ছৃঙ্খল নয়। কোনো বাজে নেশাও নেই। গত সাত বছরে বেতন থেকে একটু একটু করে কিছু টাকা জমিয়েছিল। যদিও তার মধ্যে অধিকাংশই বিয়ের সময় খরচ হয়ে গিয়েছে। যেটুকু আছে, তাতে আরও কয়েক মাস চলে যাবে। কিন্তু তারপর! সুজয় আর ভাবতে পারে না। গত দু সপ্তাহে মঞ্জরীকে কিছু বুঝতে দেয়নি সুজয়। প্রতিদিন আগের মতোই অফিসের ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কখনও শপিং মলে, কখনও রেল স্টেশনে, আবার কখনও ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে কোনো স্মরণ সভা, চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে প্রবেশ অবাধ, সেখানে সময়

কাটিয়ে ফিরেছে। কয়েকবার টিকিট কেটে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামেও গিয়েছে। জায়গাটা ভালো লাগে সুজয়ের। চারপাশে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। উঁচু ছাদ আর মোটা দেওয়ালের মাঝে সময় যেন থেমে গিয়েছে।

আজ একটা বাসে বি. বি. ডি. বাগ এসেছিল সুজয়। তারপর নিরিবিলি একটা বসার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিল এই পার্কে। খুঁটিয়ে দেখেছিল সঙ্গে আনা খবরের কাগজগুলো। একটা 'ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ'এর খবর ছাড়া তেমন কোনও কাজের খবর ছিল না।

জোরে আসা একটা হাওয়ার ধাক্কায় খবরের কাগজটা উড়ে গেল। উঠে বসে সুজয়। ঘড়িতে সবে সাড়ে এগারোটা। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউটা টালিগঞ্জে, বেলা ৩টেয়। এখনও অনেকটা সময় কাটাতে হবে। গাছের আড়ালে সেই ছেলে আর মেয়েটি এখনও একইভাবে বসে আছে। সুজয়ের মতো ওদেরও বোধহয় কোনো কাজ নেই, শুধু প্রেম করা ছাড়া। সুজয় কখনও পার্কে বসে প্রেম করেনি। তবু জানে, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে অনেক কথা থাকে। হয়তো সে সব কথা জগতের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। তবু কথা যেন শেষ হতে চায় না। সব কথার উদ্দেশ্য থাক বা না থাক, কথা বলাতেই আনন্দ। মঞ্জরীর সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে সুজয় যখন ফোনে তার সঙ্গে কথা বলত, তখনও কথা শেষ হত না। এখন সুজয় বুঝতে পারে, প্রেম করার থেকে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক বেশি কঠিন।

সুজয় যখন বেঞ্চটায় এসে বসেছিল, তখন ছায়া ছিল। এখন রোদ এসে পড়েছে। অন্য জায়গায় সরে যাওয়ার পরিবর্তে ব্যাগ নিয়ে একেবারে উঠে পড়ে সে। পার্ক থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে বি. বি. ডি. বাগের দিকে হাঁটতে শুরু করে। পথের ধারে এক জ্যোতিষী গামছা মাথায় দিবানিদ্রা দিচ্ছে। খাঁচার টিয়া ঘাড় ঘুড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছে। একটা ছোলা-বাদামওয়ালার থেকে পাঁচ টাকার বাদাম কেনে। কাগজের মোড়কে একটু ঝাল-নুন। সদ্য ভাজা বাদাম। এখনও গরম। খেতে বেশ লাগে। এই পথে আগেও এসেছে সুজয়। তবে সময়াভাবে চারপাশটা ভালো করে দেখা হয়ে ওঠেনি। আজ কাজের তাড়া নেই। সেজন্যই হয়তো অনেক না দেখা দৃশ্য চোখে পড়ে যাচ্ছে। সুজয় বুঝতে পারে, কর্মব্যস্ত শহরের বুকে তার মতো আরও কিছু মানুষ রয়েছে, যাদের কোথাও যাবার তাড়া নেই। পথের ধারে যেখানেই গাছের ছায়া, সেখানেই কোনো বিক্রেতা তার পসরা সাজিয়ে বসেছে। জটাধারী এক সাধু পথের ধারে দুনিয়ার শিকড়-বাকড় নিয়ে বসেছে। সর্বরোগের অব্যর্থ দাওয়াই। তার পাশেই আর একটি ছোকরা সাজিয়ে বসেছে রুদ্রাক্ষের মালা, ঘোড়ার নাল আর কিছু রঙিন পাথর। কিছু লোক এসব নিশ্চয়ই কেনে, না হলে ব্যাবসা চলছে কী করে!

একটা মুটে ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য মাথার ঝাঁকা নামিয়েছিল। তারপর একার চেষ্টায় কিছুতেই আর মাথায় তুলতে পারছে না। সাহায্যের আশায় চারপাশে তাকাচ্ছে, কিন্তু পাশে হেঁটে যাওয়া অফিসবাবুদের সাহায্যের কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। লোকটার দুরবস্থা দেখে করুণা হয় সুজয়ের। সে ব্যাগটা পিঠে নিয়ে দুহাতে ঝাঁকাটা ধরে তুলে দেয় মুটের মাথায়। খুবই ভারী ঝাঁকা। মনে হয় ধর্মতলায় দূরপাল্লার কোনো বাসে তুলে দিতে যাচ্ছে। বয়স হয়েছে, তবু জীবিকার তাগিদে কতই না কষ্ট করতে হয় মানুষকে।

অফিসপাড়ার ফুটপাথ জুড়ে অফুরন্ত খাবারের দোকান। ছোটো ছোটো ত্রিপল টাঙিয়ে ব্যাবসা চলেছে। রুটি-তরকারি থেকে শুরু করে ভাত-মাছ, খিচুড়ি, ধোসা, ইডলি, চাউমিন, বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন — যা চাই তাই পাওয়া যাবে। হাল্কা টিফিনের জন্য ঝালমুড়ি, মুড়ি-শশা, মুড়ি-চপ, চিড়ে দই, ডিম টোস্ট, মাখন টোস্ট ইত্যাদি রয়েছে। কাচের ঢাকা দেওয়া পাত্রে দই, রাবড়ি, সরভাজা, গোলাপজাম, রসগোল্লা, সন্দেশ, বেলের মোরব্বা থরে থরে সাজানো। এছাড়া স্বাস্থ্যসচেতনদের জন্য নানা রকম ফল এবং ফলের রস তো রয়েছেই। দামও বেশি নয়। দেড়লাখি বাবু থেকে শুরু করে দশ হাজারি কর্মচারী সকলে এক সঙ্গে খাচ্ছে। কারও কোনো নাকউঁচু ভাব নেই, নেই হীনম্মন্যতা। সে সব যাদের আছে, তারা এখানে আসে না। সুজয়েরও সে সব কিছু নেই। বেশ কয়েকবার খেয়েছে এখানে। আজ এখনও খাবার সময় হয়নি। তবে দুপুরে কিছু তো খেতে হবে, টালিগঞ্জে এত সস্তায় খাবার মিলবে না। একটা ধোসার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। চাটু থেকে নামানো গরম ধোসা গলাধঃকরণ করতে ঘাম ছুটে যায় সুজয়ের। তেল, ঝাল, মশলা সবই বেশি। সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের বাংলা সংস্করণ। পাশের একটা দোকান থেকে দুটো গোলাপজাম খেয়ে নেয়। সর্বসাকুল্যে লাঞ্চের খরচ ত্রিশ টাকা। সস্তা যে এ কথা মানতেই হবে। মানিব্যাগটা পকেটে ঢুকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে সুজয়। ঘড়িতে এখনও সাড়ে এগারোটা! পার্কে বসেও তো একই সময় দেখেছিল। তার মানে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে সময় জানা গেল — পৌনে দুটো। তার মানে হাতে আর বেশি সময় নেই। ধর্মতলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে মেট্রো ধরলে যথাসময়ে টালিগঞ্জে পৌঁছোনো যাবে। ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আজ আবার মঞ্জরী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। আজ তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে সুজয় যখন এল, তখন স্টেশনের ঘড়িতে দুটো কুড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ফোনটা এল। আজকাল ফোন এলে সুজয়ের বেশ অস্বস্তি হয়। ফোনে প্রথম প্রশ্নটাই হয় — এখন কোথায়? যে উত্তর দু-সপ্তাহ আগে দেওয়া সহজ ছিল, এখন আর তা নেই। যদি বলে

'অফিসে', তাহলে আশপাশের লোক বুঝবে মিথ্যা বলছে। সত্যি কথা বললে তার পরিপ্রেক্ষিতে হাজার প্রশ্ন, কেন? কী কাজে? কখন ফিরবে? — ইত্যাদি। মিথ্যা কথা বলা সুজয়ের অভ্যাস নেই। তাই ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। ফোন যদি মঞ্জরীর হয় তো আরও বিপদ। আজকাল তাই অনেক সময় ফোন ধরে না সুজয়। ফোনটা ব্যাগের ভিতরে রাখা ছিল। বার করতেই দেখল — নিশীথ স্যারের ফোন। সুজয় প্রায় কাউন্টারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এল।

-- হ্যাঁ স্যার বলুন।

-- তুমি এখন কোথায়?

-- আমি একটু এসপ্ল্যানেডে এসেছিলাম। টালিগঞ্জে যাব একটা ইন্টারভিউ দিতে।

-- ইন্টারভিউ দিতে ডেকেছিল?

-- না ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। আজই কাগজে দেখলাম।

-- শোনো, আমার এক বন্ধুর একটা পাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আছে হাওড়ায়। বড়োবাজারে এন. এস. রোডে অফিস-কাম-শো-রুম। আমি তোমার জন্য ওকে বলেছি। তুমি আজ একবার এন. এস. রোডে ওদের অফিসে দেখা করতে পারবে?

-- হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই পারব।

-- কিন্তু তুমি তো আবার টালিগঞ্জে যাবে।

-- তা হলে আর টালিগঞ্জে যাব না। এমনিতেও ওখানে তেমন কোনো আশা নেই। কোনো রেফারেন্সও নেই।

-- বেশ, তুমি কতক্ষণে যেতে পারবে? আমি এস. এম. এস. করে ঠিকানাটা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

-- আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব স্যার।

কথা বলতে বলতে মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে সুজয়। সামনে একটা ফাঁকা ট্যাকসি দেখে ডাকতে গিয়েও থেমে যায় সুজয়। ট্যাক্সি চেপে বড়োবাজারে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তার থেকে স্ট্যান্ড রোড হয়ে হাওড়াগামী বাসে ওঠাই ভালো।

হাওড়া ব্রিজের কাছে বাস থেকে নেমে পড়ে সুজয়। আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। পথে পড়ে থাকা কাগজ, প্লাস্টিক উড়ছে। বৃষ্টির আগে গন্তব্যে পৌঁছোতে পারলে হয়! কয়েকজনের কাছে পথনির্দেশ নিয়ে সুজয় পৌঁছে যায় নিশীথ স্যারের নির্দেশিত অফিসে। কাচের দরজা খুলে ঢুকতেই দারোয়ান এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে — কার কাছে যাবেন?

সুজয় বলে — আমাকে এন. আর. রায় পাঠিয়েছেন। এই অফিসের ইনচার্জের সাথে দেখা করার জন্য।

দারোয়ানটি সুজয়কে বসতে বলে ভিতরে ঢুকে যায়।

সাততলা বাড়িটার বয়সের গাছ-পাথর নেই। বাড়ির কার্নিশেই বেশ কিছু অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলেছে। বাড়ি পুরোনো হলেও দোতলার এই অফিসের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। ঝাঁ চক্‌চকে অফিস। একটা শো-কেস-এ নানারকম পাম্পের মডেল সাজানো। পাম্প সম্পর্কে সুজয় অনভিজ্ঞ, তবে অ্যাকাউন্টস এর ব্যাপারটা বোঝে, সেটাই ভরসা। আজ এখানে কোনো ইন্টারভিউ চলছে বলে মনে হচ্ছে না সুজয়ের। ঠাকুর-ঠাকুর করে যদি চাকরিটা লেগে যায়, তবে বেঁচে যায় সুজয়। অনিশ্চয়তা আর মিথ্যার চাপ সে আর নিতে পারছে না।

একটু পরেই দারোয়ানটি এসে বলল — স্যার, আপনি ডানদিকের ওই কাচের ঘরে চলে যান।

ঘরে ঢুকে কী বলবে তা ভাবতে ভাবতে সুজয় দ্বিধাগ্রস্ত হাতে দরজা ফাঁক করে বলে — মে আই কাম ইন?

দীর্ঘ টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ারে বসা মানুষটি বাঙালি বলেই মনে হল সুজয়ের। বয়স ষাটের কাছাকাছি। নিশীথ স্যারের মতোই হবে।

সুজয়কে বসতে বলে তিনিই বলতে শুরু করলেন — আমার নাম প্রদীপ সরকার। আমি এই কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার। কলকাতার অফিস দেখাশোনা করি। নিশীথবাবু আমার বিশেষ বন্ধু। উনি আপনার কথা বলেছিলেন। আমাদেরও রাঁচির ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট দরকার। একেবারে নতুন লোক নিলে অসুবিধা হবে। তাই এখানে যিনি অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছেন, তাকে আমরা রাঁচির ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠাচ্ছি, আর এখানকার জন্য একজন অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট খুঁজছি। নিশীথবাবু যখন আপনার কথা বলেছেন, তখন আমাদের আর যাচাই করার কিছু নেই। তবে একটা ফর্মালিটি আছে তো। আপনি আপনার একটা বায়োডাটা আর দু কপি ফটো দিয়ে দেবেন।

বায়োডাটা আর ফটো সুজয়ের ব্যাগেই ছিল। ব্যাগ থেকে বার করে এগিয়ে দেয় মিস্টার সরকারের দিকে। মিস্টার সরকার বায়োডাটার উপরে চোখ বুলিয়ে মৃদু মাথা নাড়ান। শরীরী ভাষায় যার অর্থ — ঠিক আছে।

-- তাহলে কবে থেকে আসতে হবে? সুজয় প্রশ্নটা না করে থাকতে পারে না।

-- অ্যাজ আর্লি অ্যাজ য়্যু লাইক। কাল থেকেই আসতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, আজ থেকেও শুরু করতে পারেন। টাকার কথাটা বলে নেওয়া ভালো। দেখুন, নিশীথবাবুর ওখানে যা পেতেন বর্তমানে সেটাই পাবেন। পরে পারফরম্যান্স এবং সিনিয়রিটি অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

-- থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্যার। আমি কাল থেকেই জয়েন করতে চাই।

-- বেশ। চলুন, আমি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

প্রদীপ সরকার সুজয়কে সঙ্গে নিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বর্তমান অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে আলাপ হলে জানা গেল তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম. পাশ করেছেন, সুজয়ের দু বছর আগে। পূর্বে আরও দুটি কোম্পানিতে চাকরির পরে এখানে। সুজয়কে অভয় দিয়ে বললেন, এখানে কাজ করো, ভালো লাগবে। জানা গেল অফিসে মোট সাতজন কর্মী। হাওড়ায় বড়ো ওয়ার্কশপ আছে। সেখানে কর্মীসংখ্যা অনেক।

সকলের সাথে আলাপচারিতায় সময় চলে যায়। বিদায় জানিয়ে সুজয় অফিস থেকে যখন বেরোল, তখন রাস্তায় জল জমে রয়েছে। তার মানে ভালো রকম বৃষ্টি হয়ে গেছে। যাক, গুমোট ভাবটাও কেটেছে। সন্ধ্যা হয় হয়। গোধূলির আলোয় শহরটা যেন অন্যরকম লাগছে। অভ্যাসবশে ঘড়ি দেখতে গিয়ে মনে পড়ল, ঘড়িটা বন্ধ। কিছুটা হেঁটে রাধাবাজারের দিকে গেলে, এখনই সারিয়ে নেওয়া যায়, তবে এখনই দরকার নেই। বিয়েতে পাওয়া আরও দুটো ঘড়ি বাড়িতে পড়ে আছে। আজ বরং তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাওয়া দরকার। আজ বাড়ি যাওয়ার আগে এক গোছা রজনীগন্ধা বা গোলাপ কিনতে হবে। আর কিছু মিষ্টি। তবে তারও আগে নিশীথ স্যারকে ফোন করতে হবে।

সুজয় ফোন করতেই নিশীথ স্যার নতুন চাকরির জন্য অভিনন্দন জানালেন। বললেন, প্রদীপ সরকার তাঁকে একটু আগেই ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন।

সুজয় কথা বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কোনওক্রমে বলে — স্যার, আপনি আমার কতটা উপকার করলেন তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিশীথ স্যার বলে ফেলেন একেবারে নিজস্ব কিছু কথা। বললেন, জানো সুজয়, এই এন. জি. ও.-র সূচনা আমি ব্যক্তিগত লাভের জন্য করিনি। উত্তরাধিকার সূত্রে আমার নিজের যেটুকু আছে, তাতে আমার জীবন কেটে যাবে। আমার পরিবার নেই, পিছুটানও নেই। খানিকটা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে, কিছুটা শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহে আমি সমাজসেবায় নেমেছিলাম। ভেবেছিলাম, কিছু বেকারের চাকরি হবে, সমাজসেবাও হবে। আজ বুঝতে পারছি, আমার আরও দূরদর্শী হওয়া উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল তোমাদের জীবন থেমে থাকবে না। দায়-দায়িত্ব থাকবে এবং বাড়বে। সংস্থা বন্ধ হলে তোমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনো 'ব্যাক আপ প্ল্যান' আমি করে রাখিনি। এটাই বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। তোমাদের কথা ভেবে অনেক রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। এমনও মনে হয়েছে, পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করে টাকাটা সংস্থার ফান্ডে দান করে আবার তোমাদের ফিরিয়ে আনি। আবার এটাও মনে হয়েছে, তাতে আর কতদিন! আর একটা, কী দুটো বছর। তাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। আমার যেটুকু চেনাজানা আছে, সেটা কাজে লাগিয়ে আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করছিলাম। আজ তোমার একটা গতি হল। বাকিদের জন্যও ভাবনাচিন্তা করছি।

কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু হয়ে আসে সুজয়ের। মানুষটা তাদের জন্য এতদূর ভেবেছেন! চাকরি হারানোর পরে অফিসের অনেকে নিশীথ স্যারের অবর্তমানে তাকে গালমন্দ করতে ছাড়েনি। আজ নিশীথ স্যারকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে হচ্ছে সুজয়ের।

একটা ফুলের দোকান দেখতে পেয়ে এক ডজন লাল গোলাপ কিনে ফেলে সুজয়। মঞ্জরীর পছন্দ। মিষ্টির দোকান থেকে নরম পাকের সন্দেশ। দামটা একটু বেশি কিন্তু দোকানটার নামডাক আছে। বাসস্ট্যান্ডে একটা এ. সি. বাস দেখতে পেয়ে দৌড়ে উঠে পড়ে সুজয়। চোদ্দো দিনের বেকারত্ব চোদ্দো বছর বনবাসের সামিল ছিল। আজ সে আবার নিজের রাজ্যপাট ফিরে পেয়েছে। আজ একটু বিলাসিতা করা যেতেই পারে।

কলিং বেল বাজাতে দরজা খোলে মঞ্জরী। গোলাপের তোড়া আর মিষ্টির প্যাকেট টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মঞ্জরী বলে — দিনটা তোমার মনে ছিল! আমি ভাবলাম, বোধহয় ভুলেই গেছ। ভালো করে দেখ তো, ঘরে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?

সুজয় চারপাশ নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারে, জানলায় নতুন পর্দা ঝুলছে।

মঞ্জরী বলে চলে — আগের পর্দাগুলোর রং জ্বলে গিয়েছিল। তাই মায়ের সঙ্গে গিয়ে কাপড় কিনে এনেছিলাম। রূপা বউদির ঘরে সেলাই মেশিনটা তো পড়েই ছিল। সেটা নিয়ে দু দিন ধরে এগুলো বানিয়েছি। মাত্র সাতশো টাকায় সব পর্দা হয়ে গেল। কী, ভালো হয়েছে না?

— খুব ভালো।

— তুমি হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি তোমার জন্য লস্যি বানিয়ে নিয়ে আসছি।

সুজয় কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রাখে। টেবিলের ড্রয়ার টেনে মানিব্যাগ, রুমাল আর চাবি রাখতে গিয়ে মনে হয় আরও কিছু যেন রয়ে গেছে পকেটে। সেই বন্ধ হওয়া ঘড়িটা। রাখার সময় মনে হল, সেকেন্ডের কাঁটাটা ঘুরে চলেছে। হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে সুজয়। হ্যাঁ, ঠিকই তো! তার মানে ঘড়িটা খারাপ হয়নি। কিছু সময়ের জন্য থেমে গিয়েছিল মাত্র।

# প্যারালাল ইউনিভার্স

## বিপ্লব ভট্টাচার্য্য

দুমড়ে-মুচড়ে পড়েছিল সময়। কার্ভড স্পেস টাইমের ফাঁকে ফাঁকে গাঁথা ছিল যন্ত্রণা। দেখা, শোনা, বোঝার বাইরে অন্য কোনো ডাইমেনসনে লুকিয়ে ছিল, আছে এবং থাকবে, সব। রোজ সকালের আধসেঁকা পাঁউরুটির ছিদ্রে ছিদ্রে লুকিয়ে থাকা বাতাসের খোঁজ কেউ রাখে না। মাখন বা জ্যামের প্রলেপ দিয়ে সেই যন্ত্রণা আমরা রোজ গিলছি।

দশটা বাজে। ফোনটা এখনও এলো না! হাঁসফাঁস করছে বুকটা। দু-টুকরো বাদামের সাথে একটা পেগে চুমুক বসাতে বসাতেও মনটা ডুকরে উঠছে। দু-তিনবার হাতটা ফোনের কল বাটনটা টিপতে গিয়েও ফিরে এল। আর কিছুটা সময় দেখি। সঙ্গে আর-এক পেগ। তারপর কখন নেশায় ডুবে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। সেই ফোনের অপেক্ষার আর শেষ হয়নি। কার্ভড স্পেস টাইমের ফাঁকে কোনো এক প্যারালাল ইউনিভার্স-এ হয়তো ফোনটা এসেছিল। সকালে উঠে আধসেঁকা পাঁউরুটির ওপর জ্যাম এর প্রলেপ দিয়ে গলাধঃকরণ। তারপর আবার যে কে সেই।

পরীক্ষাটা বেশ ভালোই হয়েছিল। নিজের নামটা সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটদের তালিকায় দেখে আনন্দটা ধরে রাখতে পারিনি। রোজ সকালে বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখি, ছেঁড়া একটা জামা আর একটা ময়লা হয়ে যাওয়া প্যান্ট পরে। দুপুরে অথবা রাতে খেতে বসে কোনোদিন ভাবিনি আজকের খাবারটা কীভাবে জোগাড় হল। সেই বাবা যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এতদিনের জমানো চোখের জলে আমার জামাটা ভিজিয়ে দিল, তখন যেন আমার সমস্ত 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' হয়েছিল।

তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। আমার কতশত বন্ধু চাকরি পেল। আমি জয়েনিং লেটারের অপেক্ষায় এখনও। সকালে উঠে আধসেঁকা পাঁউরুটির ওপর জ্যামের প্রলেপটা আর কতদিন দিতে পারব জানি না। তারপর উন্মোচিত হবেই, পাঁউরুটির বুকে ছিদ্রে ছিদ্রে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা। আজকের মতো পাউরুটির ওপর জ্যামের প্রলেপ দিয়ে গলাধঃকরণ। তারপর আবার, যে কে সেই, অপেক্ষা। সম্ভাবনাময়তার মায়া কাটিয়ে কোনো এক প্যারালাল ইউনিভার্স-এ হয়তো জয়েনিং লেটারটা পৌঁছেছিল আমার হাতে।

সকাল দশটায় প্রেজেন্টেশন। স্নান খাওয়া সেরে আমি তৈরি। কিন্তু বৃষ্টিটা যেন হার মানতে চায় না। আমার এত বছরের সমস্ত পরিশ্রমের মর্যাদা পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ আজকের প্রেজেন্টেশনের ওপর। আধসেঁকা পাঁউরুটির ওপর জ্যামের প্রলেপ দিয়ে কয়েক কামড় দিয়ে স্টেশনে পৌঁছোলাম বৃষ্টিতে ভিজেই। ''কৃপয়া ধ্যান দে, বারিশ কে কারণ ইস লাইন কি সারি ট্রেনে বন্ধ হ্যাঁয়। প্রতীকশা করে, ট্রেন চালু হোনে পে সূচিত কিয়া যায়েগা।'' তারপর অপেক্ষা, সাথে বৃষ্টি আর চোখের কোণে জমতে থাকা, ঘাম না জল, কী যেন একটা। কার্ভড স্পেস টাইমের অবাধ্যতার শিকার হলাম আবার। কোনো এক প্যারালাল ইউনিভার্স-এ হয়তো ট্রেনটা সময়মতো এসেছিল।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে সামনে প্লেটটা টেনে বসলাম, আধসেঁকা পাঁউরুটিটা আর পাশে জ্যামের শিশি। রানু একবার ছুটে এসে, 'ছাদে কাপড়গুলো মেলে এসেই দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা কর', বলে আবার ছুটেই সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে গেল। বেচারি সারা সকাল কাজের চাপে নাস্তানাবুদ। তবু রানুর হাতে মাখানো জ্যাম না হলে পাঁউরুটিটা আমি খেতে পারি না। অপেক্ষায় আমার সমস্যা নেই। হঠাৎ একটা ধপাস শব্দ, সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে জ্যামের প্রলেপ দেওয়ার অভ্যাসের সমাপ্তি। আর শুরু অপেক্ষার। হয়তো অন্য কোনো প্যারালাল ইউনিভার্স-এ আমি রানুকে বলেছি, আজ তুমি একটু রেস্ট নাও আমি জামাকাপড়গুলো মেলে দিয়ে আসি।

হঠাৎ মাথার মধ্যে বীভৎস একটা শব্দ হতে লাগল, অবিরাম, বিরক্তিকর। কান ঝালাপালা হয়ে যেতে লাগল, মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল। একটা টনটনে ব্যথা ক্রমশ মাথা থেকে কপালে, চোখে ছড়িয়ে পড়ছে। আর টাল সামলাতে না পেরে শরীরটা হাওয়ায় ভেসে গেল, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। অ্যালার্ম ঘড়িটা তখনও বেজে চলেছে। সূর্যের আলোটা সোজা জানালা দিয়ে চোখে এসে পড়েছে। হয়তো কোনো এক প্যারালাল ইউনিভার্সে এগুলো একটাও স্বপ্ন নয়! রানু চা-এর কাপটা টেবিলে রেখে বলে গেল, 'অনেক বেলা হল, উঠে পড়ো, আমি জামাকাপড়গুলো মেলে দিয়ে আসি ছাদে।'

# যাযাবর মধ্যাহ্ন

## সেখ ইমাদুল ইসলাম

ঘুম থেকে উঠে বেড টি-তে চুমুক দিয়ে কাপটি টেবিলে রেখে পাশের চেয়ারে বসে সকালের খবরের কাগজটি মেলে ধরেছিল ইসরাফিল। কাগজটি পাখার হাওয়ায় উড়ছে, সেদিন রূপনারায়ণের ধারে বেড়াতে গিয়ে আয়েশার শ্যাম্পু করা এলো চুলে নীল শাড়ির আঁচল যেমন উড়ছিল। দু-আঙুলের ফাঁকে ধরে থাকা সিগারেটের আগুন আঙুলে সেঁকা দিতেই হঠাৎ চিন্তার রেশটুকুতে ছেদ পড়ে ইসরাফিলের।

সকালে সময় কম বলে প্রথমে খবরের হেডলাইনে তাড়াহুড়োয় চোখ বুলিয়ে নিতে থাকে ইসরাফিল। শেষে খেলার পাতার পর আবার প্রথম পাতায় ফিরে আসে। উপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'নেতাই-এ হার্মাদের গুলিতে মৃত ৯, আহত অনেকেই'। হঠাৎ মনটা চলে যায় গহন জঙ্গলের মাঝে। যে নিরীহ মানুষগুলো পিঁপড়ের ডিম, গাছের পাতা, বুনো ওল, কচু খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা ঘরছাড়া। বাতাসে বারুদের গন্ধ। হৃদয়ের গভীরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে ইসরাফিল। ডান হাতের আঙুলগুলোকে ভাঁজ করে হাতটাকে সজোরে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানায়। পরের পাতায় চোখে পড়ে, 'এবার এক পাগলি ধর্ষণের শিকার, গ্রেফতার ১'। ''এরা মানুষ?'' ইসরাফিল নিজেই বলে ওঠে। দেশব্যাপী চলমান যৌন নিপীড়ন এবং ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানায় মনে মনে। ঠিক তার পরের পাতায়, 'আগুনে পুড়িয়ে বধূহত্যা'। ওটাকে আর আজকাল খবর বলে মনে হয় না। কিন্তু খবরের শুরুতে 'আয়েশা' নামটিতে চোখ পড়তেই তার মন ডুবে যেতে থাকে অতীতে। বিয়ের মাত্র দশদিন আগে মেদিনীপুর শহরের শ্রাবণী মেস-এ দেখা হয়েছিল আয়েশার সাথে, প্রায় দুই বছর আগে।

ইসরাফিলের তখন ম্যালেরিয়া জ্বর, মাথা তুলতে পারছে না। ভর দুপুর, মেস-এর সকলেই অফিসে বেরিয়ে গেছে। হাজার ভাবনা মনের ভেতরে কিলবিল করছে। রূপনারায়ণের পাড়ে দাঁড়িয়ে ইসরাফিল সেদিন তার মনের কথা আয়েশাকে বলেছিল। তারপর ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং এর 'Last Ride Together' কবিতা থেকে আবৃত্তি করেছিল —

*I and my mistress, side by side*
*Shall be together, breathe and ride...*

সংসারের অভাব অনটনের কথাও আয়েশাকে বলেছিল। কিন্তু আয়েশা তবুও অশান্ত, কোনোকিছুই বুঝতে চায় না।

—এসব কথা সেদিন শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ইসরাফিল। আয়েশার মতো উচ্চবিত্ত, বিলাস প্রাচুর্যে লালিত এমন একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে আবৃত্তির আবেগে আটকে রাখা যাবে না। মেস-এর ভৃত্য 'সাবির'কে ডেকেছিল। 'আসছি' বলে তার আর দেখা নাই। .... আয়েশার পটলচেরা চোখ দুটোর মধ্যে এক চিরন্তন ভালোবাসাকে দেখতে পেয়েছিল ইসরাফিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গায়ের চাদরকে মাথা পর্যন্ত টেনে পাশ ফিরে শোয় সে। প্রচণ্ড জ্বরে চোখ বন্ধ রেখে প্রলাপ বকে — ওই যে পৃথিবীর যত ঝড়— সাইক্লোন, টর্নেডো, টাইফুন, লায়লা, আয়লা পৃথিবীটাকে তোলপাড় করে একসময় শান্ত হয়, সেই ঝড়ের দিকে তাকিয়ে আমাকে ভুলে যাও আয়েশা। ঠিক সেই মুহূর্তে কপালে হাত রাখার স্পর্শ অনুভব করে। ধমক দিয়ে বলে, ডাক্তারি করতে হবে না সাবির, মাথাটা একটু টিপে দে। কপালে স্পর্শ রাখা হাতটি মাথা টিপতে শুরু করে মৃদুভাবে। তারপর কপালের নির্দিষ্ট ব্যথার জায়গাটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হাতটি হাতে ধরতেই চমকে উঠে। চোখ মেলে দেখতে পায়, ওর মাথার কাছে বসে আছে আয়েশা। শ্মশানবাসিনীর মতো রুদ্র, ভয়ংকর চেহারা, চোখে উদাস চাহনি।

কাগজটি হাতে নিয়ে অনেক স্মৃতির ভিড়ে কখন যে এত গভীরে তলিয়ে গেছিল তা টের পায়নি ইসরাফিল। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখে অনেক বেলা হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জামা-প্যান্ট পরে সংবাদপত্রটি ভাঁজ করতে করতে স্টেশন অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনে জানালার ধারে বসে ইসরাফিলের হৃদয় কখনো ঝড়, কখনো বৃষ্টি, আবার কখনো বিদ্যুতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। হাওড়া স্টেশনে নেমে কলকাতার জনপথে মানুষের ভিড়ে এগিয়ে চলে সে। অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য কথা ঘুরে ফিরে মনকে আরো বেশি ভারাক্রান্ত করে তোলে।

কী অজ্ঞাতসারে পরিচয় হয়েছিল সেদিন আয়েশার সাথে। কলেজ স্ট্রিটের একটি মিউজিক স্টলের কাউন্টারে বসে ইসরাফিল



Contents

গল্প করছিল। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এই দোকানটি ইসরাফিলের আবৃত্তির ক্যাসেটের সোল-ডিস্ট্রিবিউটার। একটি ছিপছিপে লম্বা ফর্সা মেয়ে ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, ''ইসরাফিল হোসেনের ক্যাসেট আছে? 'নন্দীগ্রাম জেগে উঠেছে', 'তাপসী আর ফিরবে না', 'রক্তে রাঙা কেশপুর'?''

''হ্যাঁ আছে।''

ইসরাফিল উত্তর দিয়েই সেলসম্যান ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি ফিক করে হেসে বলে,

''উনিই ইসরাফিল হোসেন।''

মুহূর্তে মেয়েটির মুখের আদল বদলে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে ইসরাফিল বিনীতভাবে হাত দুটো একত্রিত করে সৌজন্যমূলক হাসল। মেয়েটি প্রত্যুত্তরে নমস্কার করে বলল,

''আমি আয়েশা খাতুন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে এম.এ. পড়ি। আপনার আবৃত্তির একান্ত শ্রোতা।''

''আবৃত্তি হয় আমার''?

''বা রে? পত্র-পত্রিকাতে আপনার কত প্রশংসা। আমার তো ভালো লাগে।''

একেবারে সামনা-সামনি কোনো মহিলা শ্রোতার কাছ থেকে এরূপ প্রশংসা শোনেনি ইসরাফিল। তিনটি ক্যাসেট হাতে নিয়ে আয়েশা বলে,

''আমার ডাইরিতে আপনার নিজের হাতে নিজে কিছু একটা লিখে দিন।''

ইসরাফিল যত্ন সহকারে লিখে দেয় — ''কুমারী আয়েশা খাতুনকে, ইসরাফিল হোসেন''।

ইসরাফিলকে এখন আর একা থাকতে হয় না। ইসরাফিলের খুব কাছের বন্ধু ও তার জীবনের সাথি তার 'একাকীত্ব'। আয়েশার বিয়ে হয়েছে কলকাতার বড়ো ব্যবসায়ী রাজাবাজারের মল্লিক পরিবারে। ইসরাফিল সেই বাড়ি চেনে। হঠাৎ ভেবে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে বাড়িটার ঠিকানায় যাবে। সেদিকে এগিয়ে চলে সে। তারপর নানা চিন্তাভাবনায় ডুবে যেতে থাকে।

আয়েশাকে যেমন দেখতে ছিল পরির মতো, তেমনই তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। আর অনুভূতি, তাও ছিল অসাধারণ।

আয়েশা — ''আরে ইসরাফিল! কেমন আছ?''

ইসরাফিল — ''যেমনটি তুমি রেখে এসেছিলে। আর তুমি?''

''ভালো। তা কী মনে করে এতদিন পর?''

''সবসময়েই মনে পড়ে। ইচ্ছেও করে দেখতে তোমায়। কিন্তু আসতে সাহস হয় না। অন্তিমকালে যে ব্যবহার উপহার দিয়েছিলে তুমি!''

''থাক না। ... তা তোমার জীবনের সাথি কেমন?''

''খুব ভালো।... আর তোমার স্বামী?''

''ও ভীষণ ভালো। আমায় খুব ভালোবাসে...''

আচমকা কোথা থেকে আসা একটা অ্যালসেশিয়ানের হুঙ্কারে সম্বিত ফেরে ইসরাফিলের। দেখে সেই বাড়ির দরজার সামনে চলে এসেছে সে। এতক্ষণের স্বপ্নের আঘাতে জর্জরিত হয়ে, ''উফ!'' বলে নিজের ব্যক্তিসত্তার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সামলে নেয় সে। তারপর গভীর এক প্রশান্তিতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে কলেজ স্ট্রিট-এর দিকে ফিরে আসতে থাকে।

পূরবী সিনেমার পাশে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা লম্বা বাসন্তী রঙের বিদেশি গাড়ি এসে দাঁড়াল ইসরাফিলের গা ঘেঁষে। গাড়ির ভেতর থেকে জানালার কাচ সরিয়ে চোখে রঙিন চশমা পরা এক ভদ্রমহিলা বলেন — ''ইসরাফিল দা''। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। সবিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে ইসরাফিল।

— ''এদিকে কোথায় এসেছিলেন?''

ইসরাফিল উত্তর দেবার আগেই আয়েশা আবার প্রশ্ন করে, ''আপনার আবৃত্তি কেমন চলছে? স্বাস্থ্য যে বড়োই ভেঙে গেছে।''

আয়েশা হাত নাড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে যায়। ইসরাফিল সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। অতি পরিচিত কবিতার কয়েকটা লাইন চাপা কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

সর্বনাশের লেলিহান শিখার কাছে
চাপা পড়ে মর্মন্তুদ কান্না,
নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করে শুধু
অসংখ্য জল্লাদের মাঝে আমি
বড়োই একা।

# ত্রয়ী

**অভিষেক রায়**

## চাবি

সিমলের স্বর্ণব্যবসায়ী নিকুঞ্জ বসাকের বিধবা পিসিমা ভবতারিণী আদ্যা একজন পাকা চোরের সন্ধানে আছেন। সন্ধানের পন্থা নিয়ে তিনি খুবই বিচলিত। গোটা সিমলে পাড়া জানে চোর ব্যাপারটাকে তিনি বড্ড ভয় পান। বছর কুড়ি আগে শীতের রাত্তিরে একটা চোর বাড়ির লোকের তাড়া খেয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল। ভোরবেলা তোরঙ্গ খুলে র‍্যাপার বের করতে গিয়ে সেই চোর দেখে তিনি এমন ভিরমি খেয়েছিলেন যে এই গেল সেই গেল অবস্থা।

সেই থেকে তিনি মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমোন। তাঁর সম্পত্তি বলতে একটা বিছানা, ঘরের কোণে রাখা কাপড়ে ঠাসা একটা তোরঙ্গ, তার ঠিক উলটোদিকে একটা ঠাকুরের সিংহাসন আর তিনতলায় তাঁর ভাইপো নিকুঞ্জের ঘরের তিনটে সিন্দুকের একদম বাঁ দিকেরটা। তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ওই সিন্দুকেই গচ্ছিত, যার চাবিটি তিনি কদিন হল হারিয়েছেন। নকল চাবি বানাতে গেলেই নিকুঞ্জ জেনে যাবে সিন্দুকে কী কী আছে। সেইটেই তিনি চান না।

এমতাবস্থায় কী করণীয় ভাবতে ভাবতে তিনি ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে আসন পেতে পুজোয় বসলেন। আসনটা ভারি নোংরা হয়েছে, এবারে কাচতে হবে। বহু জায়গায় সেলাই বেরিয়ে এসেছে। নিজের হাতে বোনা, তাই মায়ায় ফেলতে পারেন না। ধূপকাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে ভবতারিণী জাগতিক বিষয় থেকে মন ঠাকুরের দিকে ফেরালেন।

পুজো দিয়ে উঠে আসন তুলতে গিয়ে দেখেন একটা নতুন লাল আসন পাতা। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে তিনি ছেঁড়া আসনে বসেছিলেন। কী ব্যাপার! বারান্দায় বেরিয়ে দেখেন তাঁর ছেঁড়া আসন কে যেন কেচে মেলে দিয়েছে। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি! ভবতারিণী মনে মনে কয়েকবার রাম নাম করে ঘরে ঢুকে তোরঙ্গ থেকে পানের ডিবে বের করে বিছানার ওপর বসলেন।

তিনি পানে খয়ের দোক্তা কিছুই খান না। শুধু চুন আর সুপুরি। একটা পাতার মধ্যে চুন লাগিয়ে চার টুকরো সুপুরি রেখে মুড়ে নিয়ে সবে মুখে পুরতে যাবেন এমন সময় মাথার কাছের জানালাটায় ঠং করে একটা আওয়াজ হল। তিনি "কে র‍্যা!" বলে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন বাইরে হাওয়া ছেড়েছে, পাল্লাটা নড়ছে। পানটা মুখে পুড়ে জানলা বন্ধ করার জন্য উঠতে গিয়ে টের পেলেন পানের ভেতর থেকে সুপুরি গায়েব হয়ে গেছে। ভবতারিণী ভয়ানক ভয় পেয়ে হাঁক দিলেন, "সিধু, ও সিধু!"

"কী মা ঠাকুরন?" বুড়ো চাকর সিদ্ধেশ্বর ছুটতে ছুটতে আসে।

"জানলাটা দিয়ে দে। ঝড় আসছে। আর বিকেলে কালীঘাটে পুজো দিতে যাব। নিকুঞ্জকে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলিস।"

কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফিরেও মনে শান্তি পেলেন না ভবতারিণী। রাতে কেবল একবাটি দুধ খেয়ে দোর লাগিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। জানলাটা ঠিকমতো আঁটা আছে কিনা তাও দেখে নিলেন। মনে এত অশান্তি নিয়ে কি ঘুম আসে? সিন্দুকের চাবিটা কি নিকুঞ্জই সরালো? দুপুরবেলার ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার মানেই বা কী? এমন সময় তোরঙ্গের কাছে একটা হালকা শব্দ হল।

"কে? কে?" ভয়ে উঠে বসা ভবতারিণীর গলা থেকে ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোল।

"ভয় পেয়েন না পিসিমা। আমি গদাধর।"

"কে গদাধর?"

"এজ্ঞে, গদাধর লস্কর। লোকে মশকরা কইরে বলে গদু তস্কর।"

"তুই ঢুকলি কী করে ঘরে?" ভবতারিণী গলা তুলে 'চোর চোর' বলে হাঁক ছাড়বেন কিনা ভাবলেন।

"সে গুহ্য কথা কি কাউরে কইতে আছে পিসিমা? তবে আপনি ভালো একখান চোরের সন্ধানে ছিলেন। তাই এলেম।"

সামনে জলজ্যান্ত চোর, কিন্তু ভয়ে অজ্ঞান হলে চলবে না। তাঁর যে ভীষণ দরকার। ভবতারিণী ধাতস্থ হবার চেষ্টা করলেন। গলা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন "আমি চোর খুঁজছি জানলি কী করে?"

"গেরস্তের হাঁড়ির খবর শুধু রাইখলে কি চলে পিসিমা? মনের ভাবগতিকেরও খোঁজ রাইখতে হয়।"

"তুই! আমার পান থেকে সুপুরি...কিন্তু কী করে?"

"সেটাও তো গুহ্য কথা পিসিমা। আপনি কামটা বিস্তারে কন।"

ভবতারিণী পাশে রাখা ঘটি তুলে এক ঢোঁক জল খেলেন। এ লোককে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।

"বাড়িতে কে কে আছে তোর?"

"এজ্ঞে পরিবার আছে। বুড়া বাপ আছে, হাঁপানির রুগি। আর এক মেয়ে। কেলাস টুতে পড়ে।"

"তোকে বিশ্বাস করে কাজটা দেব কেন?"

"গদাধর চোর বটে, তবে বেইমান নয় গো পিসিমা।"

"শোন। আমার ভাইপো নিকুঞ্জের ঘরে তিনটে সিন্দুক আছে। একদম বাঁদিকেরটা আমার। তার চাবিটা আমার তোরঙ্গে থাকত, আর তোরঙ্গের চাবি আমার আঁচলে। সিন্দুকের সেই চাবি তোরঙ্গ থেকে খোয়া গেছে। মনে হয় নিকুঞ্জই সরিয়েছে। কিন্তু এখনও খুলে উঠতে পারেনি বোধহয়। নিকুঞ্জর শালা এসেছে কদিন হল, ও থাকতে খুলবেও না। আমি ছাড়া কেউ জানে না ওই সিন্দুকে কী আছে। ওরা জানতে পারার আগেই সব সরিয়ে ফেলতে হবে। তুই পারবি তো?"

"সিন্দুকে কী আছে?"

"সে তো খুললেই দেখতে পাবি।"

"জানলে কাজে একটু চার পাইতাম।"

"দুশো ভরি সোনার গয়না আর তিনটে হিরের হার।"

"কন কী!"

"কিন্তু আপনি মরলে সব সম্পত্তি তো ভাইপোই পাইব।"

"যাতে না পায় উইলে সেই ব্যবস্থাই করে যাব। নিকুঞ্জ ব্যাটা টাকার পিশাচ। ওকে আমার একদানা সম্পত্তিও দেব না। সব আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে লিখে দিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে ওদের হাতে কিছু যেন না পড়ে। পারবি তো?"

"পারুম। কিন্তু আমার মজুরি?"

"ওর থেকে সোনার একটা ভারী হার তোর।"

"ওঃ, আপনি তো সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী।"

"বাজে না বকে বল কাজটা কালকের মধ্যে পারবি কি না?"

"কাল রাত্তিরে এই সময়ের মইধ্যে আপনারে সমস্ত মালপত্র বুঝাইয়া দিমু।"

"ধরা পড়লে কিন্তু আমি তোকে চিনি না।"

"গদু তস্করের ধরবে এমন পুত জন্মায় নাই। আজ তাইলে আসি পিসিমা?"

চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরল গদাধর। তার মতো চোরের কি বেখেয়াল হয়ে রাস্তায় চলে গর্তে পড়ে ঠ্যাঙ ভাঙা সাজে? এক হপ্তা ঘরে শুয়ে কাটাতে হল, নইলে এদ্দিনে... আপশোশে মাথা নাড়ল গদাধর।

"গদু ফিরলি?" শ্বাসের টানের চোটে বারান্দায় শোয়া বাপের ঘুম আসে না রাত্তিরে। ডাক্তার-বদ্যি করার পয়সাও নেই।

"একটা কাম জুটসে বাবা। তোমায় এবার ডাক্তার দেখামু।"

"কাম মানে তো চুরি।"

গদাধর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। "চুরিই বটে। তবে ভালোর লাইগা। পয়সাও অনেক।"

"কুন বাড়ি?"

"বসাক বাড়ি। ওই বাড়ির বুড়ি পিসি কাম দিসে।" বলে ঘরের ভেতরে ঢুকতে যায় গদাধর।

"গদু শোন।" উঠে বসে গদাধরের বাপ।

"এই নেন পিসিমা আপনার সম্পত্তি।"

ভবতারিণী বাক্স খুলে একটু ঘেঁটেই বুঝলেন সব ঠিক আছে। একটা ভারী সোনার হার বেছে বের করলেন।

"বড়োই উপকার করলি বাছা। এই নে।

"সে হইবেখন পিসিমা। আরেকখান জিনিস আছে। নিকুঞ্জবাবুর বালিশের তলায় ছিল।"

একটা বড়ো লোহার চাবি বের করে বাক্সের ওপর রাখে গদাধর।

"তুই তো পাকা চোর রে গদু। চাবিটাও বাগিয়েছিস? কিন্তু এর সাথে যে একটা ছোটো শঙ্খ লাগানো ছিল, জগন্নাথধাম থেকে কেনা। সেটা কই? দাঁড়া।" ভবতারিণী বাক্স খুললেন। "এই সোনার টিকলিটা তোর মেয়ের জন্য দিলাম।"

ভবতারিণী বাক্স বন্ধ করে টিকলি হাতে তাকিয়ে দেখেন ঘরে কেউ নেই। সোনার হারটাও বাক্সের পাশে বিছানার ওপর পড়ে।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে নিজের মনেই হাসছিল গদাধর। বুড়ি বড়ো ভালো মানুষ। চোরের মেয়ের মাথায় কি সোনার টিকলি মানায়? চাবিটা গদাধর সরিয়েছিল হপ্তাখানেক আগে। কিন্তু চুরির ফাঁক পাবার আগেই রাস্তার গর্তে পা হড়কে বিছানায় সাতদিন। শঙ্খটা খুলে সে তার মেয়েকে দিয়েছে খেলতে।

নিজের চুরিবিদ্যা নিয়ে খুব গর্ব গদাধরের। কিন্তু এই প্রথম নিজের চুরির কথা মুখ ফুটে জানাতে লজ্জা পেল সে। কালকেই নিশ্চয়ই বুড়ি উইল লিখে ফেলবে। আর পাকা অভিনেতার মতো মুখ করে সবাইকে সিন্দুক খুলে দেখাবে যে ভোঁ ভোঁ। অভিনয়টা বুড়ি ভালোই করে। বিশ বছর আগে ভোরবেলা যে চোরকে পিছনের দরজা দেখিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে নিজে ভিরমি খাওয়ার অভিনয় করেছিলেন ভবতারিণী, তার ছেলে আজ পিতৃ-ঋণ

শুধতে পেরেছে এই তৃপ্তিটুকু নিয়েই নিজের বাড়ির দাওয়ায় পা রাখল গদাধর।

## ধন্যবাদ

“হুম্, কর্কট রাশি, মেষ লগ্ন, পুষ্যনক্ষত্র... তোমার সমস্যার কথা বলতে থাকো। আমি শুনতে শুনতে গণনাটা করে ফেলি।”

“আপনি তো সব জানেনই। ওই সাইনবোর্ড লেখার কারবারটা ঠিক জমছে না। বাজারে অনেক ধার দেনা। নতুন ব্যাবসা যে খুলব তারও তো... যদি কাছেপিঠে কোনো প্রাপ্তিযোগ থাকে...”

“তোমার এক জ্যাঠা আছেন শুনেছি, খুব বড়োলোক।”

“জ্যাঠামশাই বছর দুই হল দেহ রেখেছেন। জ্যাঠাইমা বেঁচে আছেন। কিন্তু তিনি আমাকে দু-চোখে দেখতে পারেন না।”

“তা তোমার জ্যাঠা তো শুনেছি নিঃসন্তান। তোমায় কিছু দিয়ে-থুয়ে যাননি?”

“কী করে জানব বলুন? জ্যাঠামশাই আমাকে প্রচ্ছন্ন স্নেহ করতেন বটে। কিন্তু জ্যাঠাইমার দয়ায় আমার ওই বাড়িতে পা রাখা নিষেধ। জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর তো আরও...”

“কী একটা দামি রত্ন আছে ওই বাড়িতে শুনেছিলাম...”

“একটা চুনি। ইয়াব্বড়ো। ওটাকে জ্যাঠামশাই সৌভাগ্যের প্রতীক বলতেন। বম্বেতে পেয়েছিলেন। তারপরেই তো ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে উঠল।”

“তাহলে উপস্থিত ওইদিক থেকে তোমার ভাগ্য ঠনঠন?”

“একদমই।”

“তোমার গ্রহের গতিপ্রকৃতি তো বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না হে শ্যামাপদ।”

“কিছু কি ধারণ-টারণ...”

“আমাকে কি ওসব তাবিজ-কবচ-আংটি গছানো ভণ্ড জ্যোতিষী পেয়েছ?”

“না না, মানে ইয়ে... ভাগ্য কি ফিরবে না?”

“ফেরালেই ফিরবে। পরোপকার করো-টরো?”

“পরোপকার? খুব করি। গরিব-দুঃখী দেখলেই প্রাণটা...”

“ভিখিরিকে চারআনা দেবার কথা বলছি না। পথে-ঘাটে মানুষ বিপদে পড়লে এগিয়ে যাও?”

“যাই বই কী। এই তো সেদিনই, দুপুরবেলা তেলেনিপাড়া দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি ‘বাঁচাও বাঁচাও’। গিয়ে দেখি, একটা লোক ম্যানহোলে পড়ে গেছে। খুব গভীর। কাছে পিঠে ডাল-দড়ি-বাঁশ কিচ্ছুটি না পেয়ে আমি নেমে পড়লাম ম্যানহোলে। লোকটা আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে পড়ল।”

“বাহ্, তুমি তো দেখছি পাকা দেবদূত। তারপর?”

“তারপর খুব স্যাড কেস। লোকটা উঠেই ভেগে পড়ল। সন্ধ্যের দিকে দমকলের লোক এসে আমায় তুলল। সেদিন থেকে ঠিক করেছি পরোপকারে আমি আর নেই।”

“না থাকলে তো হবে না বাপু। একমাত্র পরোপকারই তোমার ভাগ্যের মাথা থেকে শনির ক্রূর দৃষ্টি নামাতে পারে।”

“বলছেন?”

“বলছি মানে? আমার গণনা আজ অবধি বিফল হয়নি। এই যে পুরোনো নোট বাতিল হবে, কে গুনে বলেছিল? এই জ্যোতিষীকুলশ্রেষ্ঠ দিবাকর বাগচি। মিলেছে?”

“মিলেছে।”

“তারপর ধরো ফিল্মস্টার ইন্দ্রজিতের সাথে হিরোইন বিভাবরীর বিবাহ বিচ্ছেদ হবে, মিলেছে?”

“তাও মিলেছে।”

“তারপর, ওই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...”

“ইয়ে...এটা তো মেলেনি...”

“কী করে মিলবে? এটা তো আমি বলিনি। বলেছেন অতুলপ্রসাদ সেন।”

“তাও বটে।”

“তাই বলছি, তেড়েফুঁড়ে পরোপকারে লেগে যাও। তোমার ভাগ্যের গিঁট খুলল বলে। আমার দক্ষিণা পাঁচশো এক টাকা।”

“মানে...বলছিলাম কি, টাকাটা যদি কিস্তিতে...”

“বিনি পয়সার চিকিৎসায় রোগ সারে না জানো না? এক কাজ করো, বাইরে আমার সাইনবোর্ডটা রোদে-জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। একটা নতুন বানিয়ে দাও। কাল সকালে এসো, আমি লেখাটা তৈরি রাখব।”

ঝাঁ ঝাঁ রোদে রাস্তায় নেমেই পরোপকারের ফিকির খুঁজতে লাগল শ্যামাপদ। ভাগ্যের চাকাটা যে করে হোক ঘোরাতেই হবে। মাকুবাবুর বাজারের দিকটায় লোকজন বেশি। সেইদিকে একটু এগোতেই সে দেখতে পেল একটা লোক সবজি বোঝাই থলে হাতে হেঁটে আসছে।

হঠাৎ থলের একটা হাতল ফসকে যেতে একটা আলু আর দুটো পটল ছিটকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। লোকটা পলায়মান পটলকে ধরার জন্য নীচু হল। শ্যামাপদও আলুটাকে পাকড়াবে বলে এগোতেই শোনে ঝনঝনাঝনঝন। লোকটার বুকপকেট থেকে একরাশ খুচরো হরির লুটের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। শ্যামাপদ সাথে সাথে আলু ছেড়ে পয়সা কুড়োনোয় হাত লাগাল। লোকটা ততক্ষণে আলু-পটলকে থলেতে পুরে পায়ের কাছের দু-চারটে পয়সা কুড়িয়ে নিয়েছে।

"এই নিন।" প্রায় খানদশেক পয়সা কুড়িয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরল শ্যামাপদ। লোকটা গম্ভীর মুখে পয়সা পকেটস্থ করে বলল, "পাঁচটাকার কয়েনটা কি ঝেড়ে ফেলার তাল করছ।"

"অ্যাঁ!"

"তোমার বাঁ পায়ের তলায়।"

পা সরাতেই শ্যামাপদ দেখল একটা পাঁচ টাকার চকচকে হলুদ কয়েন।"

"খেয়াল করিনি।"

"দেখে তো ভদ্রসন্তান বলেই মনে হয়। ছ্যাঁচড়ামিটা কি শখের কারবার?" বলেই লোকটা কয়েনটা তুলে গটগট করে হাঁটা লাগাল।

"যাব্বাবা! উপকার করলাম, ধন্যবাদের তো বালাই নেই উলটে গাল দিয়ে গেল! শনির ফের, সবই শনির ফের।"

অন্যসময় হলে হয়তো হাতাহাতি লেগে যেত। কিন্তু এখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে শ্যামাপদ হাঁটতে লাগল। বারোটা বাজতে চলল, এবারে দোকানটা না খুললে আজকের কাজকারবার লাটে উঠবে।

শীতলাতলা পেরিয়ে দোকানের কাছে পৌঁছাতেই শ্যামাপদ দেখল কাঠের মোটা মোটা তক্তা বোঝাই একটা ভ্যানরিকশার পেছনের একটা চাকা রাস্তার খন্দে পড়ে গেছে। ভ্যানওয়ালা কিছুতেই টেনে তুলতে পারছে না। শ্যামাপদ দৌড়ে গিয়ে ঠেলতে লাগল। বারদুয়েক জোরে হ্যাঁচকা ঠ্যালা মারতেই একলাফে চাকাটা খন্দ থেকে উঠে এল আর একটা তক্তা একলাফে সোজা শ্যামাপদর শ্রীচরণে মূর্ছা গেল।

"উরিব্বাপরে!!" আর্তনাদ করে উঠলো শ্যামাপদ।

"কম্মকাবার কইরে দিলেন তো।" ভ্যানওয়ালা চ্যাঁচায়। এহন ওই পাহাড়টারে তুলুম কী কইর‍্যা? নেন নেন ওঠেন, হাত লাগান।"

চেঁচামেচিতে ঘাবড়ে গিয়ে ধরাধরি করে তক্তাটাকে ভ্যানে তুলে দেয় শ্যামাপদ। সাথে সাথে ভ্যান চালিয়ে সেই লোক হাওয়া। হাঁটতে গিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে শ্যামাপদ।

"শালা কী দুনিয়া! উপকার করলেই বাঁশ খেতে হচ্ছে। ভাগ্য ফেরার আগে পৈতৃক প্রাণটা থাকলে হয়। অবশ্য এত কষ্টের প্রাণ থেকেও বা কী।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল সে।

পায়ের ব্যথাটা এখন একটু কমেছে। বাড়ি গিয়ে মুড়ি-বাতাসা খেয়ে ঘুম লাগাবে। আজ আর রান্নার ঝক্কিতে যাবে না। কাল সকাল সকাল দিবাকর বাগচির কাছে যেতে হবে। পরোপকার ছাড়া অন্য কোনো উপায় যদি থাকে ভাগ্য ফেরানোর... এইসব ভাবতে ভাবতে বড়ো রাস্তার কাছে পৌঁছালো শ্যামাপদ।

বাড়ি এখনও মিনিট পনেরোর পথ। এখন রাত সাড়ে দশটা মতো বাজে। হাতের কয়েকটা কাজ সারতে সারতে দেরি হয়ে গেল। এই রাস্তা দিয়ে রাতবিরেতে লরিগুলো খুব বিচ্ছিরিভাবে যায়। দেখেশুনে পেরোতে হবে। শ্যামাপদ দুদিকে তাকাল। একটা লরি আসছে খুব জোরে।

হঠাৎ শ্যামাপদর পাশ দিয়ে একটা লোক জোরে হেঁটে রাস্তায় উঠল পেরোবে বলে। লরিটা খুব কাছে চলে এসেছে। শ্যামাপদ একটা চিৎকার দিয়ে একলাফে লোকটার কাছে পৌঁছে কোমরটা পেঁচিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। লরিটা শ্যামাপদর মুখে একটা হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যেতে দুজনেই রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ল। লোকটা লাফ দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে জামাপ্যান্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে মাটিতে পড়ে থাকা খয়েরি চাদরটা তুলে জড়িয়ে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে কুসুমপাড়ার দিকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দাঁড়াতে গিয়ে শ্যামাপদ টের পেল পায়ে আর কোমরে মারাত্মক চোট লেগেছে। বাড়ি গিয়ে আর্নিকা খেতে হবে। বেশ কয়েকটা জায়গায় জ্বলুনি হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভালো রকমের কেটে-ছড়ে গেছে।

"আর শালা জীবনেও পরোপকার করব না। প্রাণ বাঁচালেও কেউ মুখ ফুটে ধন্যবাদটুকু বলে না!" বিড়বিড় করতে করতে গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল সে। ঘুমও এসে গেল সাথে সাথে। গভীর ঘুম। ঘুম ভাঙল দরজায় দুম দুম আঘাতের শব্দে। চোখ মেলে সে দেখে সকাল হয়ে গেছে।

"খুলছি বাবা খুলছি, গরিবের দরজাটা কি না ভাঙলেই নয়?"

"আপনিই শ্যামাপদ সাঁতরা?" গম্ভীর গলায় যে লোক এই প্রশ্ন করল তার পরনে খাকি পোশাক। সাতসকালেই দরজায় পুলিশ দেখে ভেবলে গেল শ্যামাপদ। কোনোমতে মাথা নেড়ে সায় দিল সে।

"হাঁসপুকুরের ভুবনমোহিনী সাঁতরা আপনার কে হন?"

"ইয়ে... জ্যাঠাইমা।" ঢোঁক গিলল শ্যামাপদ।

"উনি কাল রাত্রে খুন হয়েছেন।"

"খু..খুন!!"

"আপনি চটপট তৈরি হয়ে নিন, একটু থানায় যেতে হবে।"

"কে... কেন?"

"ভয় নেই। কিছু রুটিন সইসাবুদের জন্য। খুনি অলরেডি ধরা পড়েছে। সিন্দুক ভেঙে লাখখানেক টাকা আর একটা বড়ো চুনি নিয়ে পালাচ্ছিল। সিন্দুকে একটা উইল ছিল, সেখানে আপনার নাম পাই। গুরুপদ সাঁতরা..."

''আ...মার জ্যাঠামশাই।''

থানায় যখন ঢুকল তখনও শ্যামাপদর বুকটা দুরুদুরু করছে। পুলিশ যদি ভাবে সম্পত্তির লোভে সে-ই খুনটা করিয়েছে? কী করে বিশ্বাস করাবে যে সে উইলের ব্যাপারে জানতই না?

''ওই যে কীর্তিমান।''

অফিসারের কথা শুনে লক-আপের দিকে তাকাতেই চমকে গেল শ্যামাপদ। দিবাকর বাগচি তাহলে সত্যিই বাকসিদ্ধ জ্যোতিষী!

''বসুন।'' অফিসারের কথায় সম্বিত ফিরল শ্যামাপদর। লক-আপের ভেতরে খয়েরি চাদরের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় সে বলল ''ধন্যবাদ।''

## আগুন

''মহাশয়, একটু আগুনটা...''

মিহি কণ্ঠস্বরের উৎস সন্ধানে মুখ তুলতে হরিনাথ দেখল বছর ত্রিশের একটা লোক হাতে বিড়ি নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের হাতের বিড়িটায় টান লাগাতে গিয়ে হরিনাথ বুঝল বেখেয়ালে সেটা কখন যেন নিভে গেছে।

মুড়ে রাখা বাঁ পা চাতাল থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে বসে বুকপকেট থেকে দেশলাই বের করল সে। নিভে যাওয়া বিড়িটা জ্বালিয়ে দেশলাইটা এগিয়ে ধরতে লোকটা সেটা নিয়ে হরিনাথের পাশে বসে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে আয়েশ করে একটা টান দিয়ে দেশলাইটা ফেরত দিল।

''আপনার বুঝি নিকটেই বাস?''

লোকটার কথা বলার ধরনটা খুব অদ্ভুত, আর গলাটা কেমন যেন মেয়েলি। হরিনাথ ফের এক ঝলক তাকাতেই লক্ষ করল লোকটার সিঁথিটা মাথার মধ্যিখানে।

''হু''

''আমি এসেছিলাম শালুকপাড়ার সর্বজ্ঞ প্রামাণিকের দর্শনার্থে। একটি বায়নার হেতু।''

এসব খেজুরে কথা শুনতে হরিনাথের একদম ভালো লাগছে না। বুকের ভেতর চাপ চাপ ব্যথা জমে আছে যেন। পাশের ঝোলাতে রাখা কেরোসিনের পাঁচ লিটারের টিনটা একবার হাত দিয়ে অনুভব করতে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল সে। বিড়িতে একটা শেষ টান মেরে টুকরোটা হরিনাথ ছুঁড়ে ফেলে দিল।

''আমাদের একটি যাত্রার দল আছে, সেই বিষয়ক...''

''থাকেন কই আপনি?'' হরিনাথ পকেট থেকে আরেকটা বিড়ি বের করল। রাত সাড়ে দশটা থেকে বটতলার চাতালে সে বসে আছে। এখন এগারোটা মতো বাজে। জায়গাটা বেশ নির্জন। আশেপাশের চারটে দোকানই ঝাঁপ নামিয়ে ফেলেছে দশটার মধ্যে।

রাস্তার উল্টোদিকের ল্যাম্পপোস্টের আলো একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে আড়াল হয়ে গিয়ে অন্ধকারটা আরও ঘন লাগছে।

''নৈহাটি।''

''ফিরবেন ক্যামনে? শ্যাষ গাড়ি তো চইলা গেছে।''

''সর্বজ্ঞবাবু বললেন বারোটা পাঁচে একখানি দূরপাল্লার গাড়ি মিলবে। সেইটি নৈহাটি থামে।''

''আপনে যাত্রাপার্টির লোক?'' বিড়ি ধরিয়ে জোরে টান দিতে গিয়ে কাশি এসে যায় হরিনাথের।

''চিত্রবাণী অপেরা। নামটি শ্রুত নয় বোধহয়? এই অঞ্চলে আমরা পূর্বে কখনও আসিনি।''

গত দশবছরে কাছাকাছি কোথাও যাত্রাপালা হয়নি। তার ছেলের বড়ো শখ ছিল সারারাত যাত্রা দেখবে। ছেলের কথা মনে হতেই একটু আগের দমবন্ধ ভাবটা অনেকটা কমে গেল হরিনাথের। হঠাৎ তার মনে হল মানুষ খুন করা খুব সহজ ব্যাপার। দুটো পা মুড়িয়ে কেরোসিন টিনের থলেটা বগলদাবা করে লোকটার দিকে একটু ঘুরে বসল হরিনাথ।

''কী পালা হবে?''

লোহা ব্যবসায়ী ত্রিভুবন সাঁপুইয়ের একটা টেম্পো চালিয়ে পুলিশের জিপে ধাক্কা মেরে হরিনাথ যখন লক-আপে ঢুকল, সাত বছরের ছেলেটার তখন টাইফয়েড।

জিপে বসে থাকা সাহেবগঞ্জ থানার মেজোবাবু সুশান্ত খাস্তগীরের কপালের ডানদিকটা একটু ছড়ে গেছিল। ব্রেকফেলের কথা তিনি বিশ্বাস তো করলেনই না উলটে ছেলের অসুখের কথা তুলে পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করায় একটা জোর লাথিতে হরিনাথকে ছিটকে দূরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আগের দিনই ত্রিভুবনের সাথে মাইনেকড়ি নিয়ে বচসা হওয়ায় সেও হাত তুলে নিল। লক-আপে বসেই ছেলের মরার খবর আর সেই শোকে তিনদিন পরে বউয়ের গলায় দড়ির খবর পেয়েছিল হরিনাথ। পনেরো দিন পরে যখন ছাড়া পেল, সব শেষ।

শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত। ফাঁকা বাড়ির উঠোনে সারারাত বসে থেকে হরিনাথের চোখে জল নয়, রাগ জমছিল।

''জতুগৃহ। মহাভারতে পঞ্চভ্রাতা আর মাতা কুন্তী একটি গালানির্মিত গৃহে...''

''জানি। আপনে কি অ্যাক্টো করেন।''

''ছোটোখাটো চরিত্র চিত্রিত করবার সুযোগ পাই কদাচিৎ।

আমার কণ্ঠ সুরেলা, তাই নির্দেশক ভজগোবিন্দবাবু আমাকে বিবেকের ভূমিকাটি বেঁধে দিয়েছেন।"

"আপনে গায়ক?"

"জতুগৃহে আমার কণ্ঠে ছয়টি গান আছে। একটি তো স্বয়ং কুন্তীর উদ্দেশে। শুনবেন?" লোকটা বিড়ি ফেলে গলাটা খাঁকরে নিল।

হরিনাথ ল্যাম্পপোস্টের নিঝুম ছায়াটার দিকে তাকাল। আরও ঘণ্টাদুয়েক তাকে বসতে হবে। রেশন থেকে আজ অনেক কষ্টে এইটুকু তেল জোগাড় করতে পেরেছে সে। ফেরার সময় দেখল বৈরাগীর বউটা তেল না পেয়ে ফিরে গেল। আজ বোধহয় মা-বেটি দুজনেই মুড়ি চিবিয়ে ঘুমোবে।

দু-মাস হল বৈরাগী ঘরে ফেরেনি। গানের নেশায় মাথা আউলে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে। শালা সংসার থাকতে সংসারের মর্ম বুঝল না। বউটা এর-ওর খেতে খেটে কোনোমতে অন্ন জোটাচ্ছে। সংসার হারানোর শোক কী জিনিস হরিনাথ তো বুঝেছে।

মনে জমা রাগটা প্রথমে চেয়েছিল মেজোবাবুকে খুন করতে। কিন্তু খুন করলে তো সব শেষ। তার বুকের উথালপাথাল করা কষ্টের হদিশ তো মেজবাবু পাবেন না। তার চেয়ে বরং....

মনস্থির করতে হরিনাথের লেগেছিল মোটে একটা রাত। মেজোবাবু সবে একমাস হল পোস্টিং হয়ে এখানে এসেছেন। এখনও পুলিশ কোয়ার্টার পাননি। পদ্মঘাটার পাশের ছোট একতলা বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। হরিনাথ জানে, সেই বাড়ির একটাই বেরোনোর দরজা।

তার ঝোলাতে কেরোসিন টিন ছাড়াও একটা শেকল আর তালা আছে। আর আছে পাকা খবর। মেজোবাবু গতকাল দরকারি কাজে তিনদিনের জন্য কলকাতায় গেছেন। বাড়িতে শুধু তাঁর বউ, চার বছরের মেয়ে আর ফাইফরমাস খাটার একটা বুড়ি।

মেয়েটাকে মায়ের সাথে বাজারে দেখেছে হরিনাথ। ফুটফুটে রাজকন্যা যেন। কিন্তু কী আর করা। ছেলে আর বউয়ের মরার খবর শুনে লক-আপে মাথা নীচু করে বসে থাকা হরিনাথকে মেজোবাবু যা বলেছিলেন, সেটাই আবার মনে মনে বিড়বিড় করল সে।

"সবই অদৃষ্ট।"

"এমন পাপের ঘোরে কেমনে ডুবিলি মাতা?
বিনা দোষে গেল পুড়ে
ছটি প্রাণ কি কসুরে?
পরপারে যদি তোরে শুধায় বিধাতা?
পুত্রমোহের ফেরে
বলি দিলি নিষাদেরে
ভাবিলি কি লোকে এরে কবে বীরগাথা?
কেন এ পাপের ঘোরে ডুবিলি হে রাজমাতা?"

"বাঃ দিব্য।"

"সুরকারও আমি।" লোকটার মিহি স্বরে একটু লজ্জা মিশে গেল।

"আপনে তো দেহি গুণী লোক।"

"কী আর গুণ। খাদ্যের সংস্থান ছিল না একদা। রেলগাড়িতে হাতসাফাই পরিবেশন করে উপার্জন করতাম। সাথে দর্শকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত গানও গাইতাম। একদিন ভজগোবিন্দবাবুর দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি আমায় কর্ম আর অন্ন দুইয়েরই চিন্তা হতে মুক্ত করেন।"

"এ পালা হিট হইবই।"

"আপনাদের আশীর্বাদে। আপনি অবশ্যই আসবেন কিন্তু পালা দেখতে। আরেকটা বিড়ি সেবন করে উঠি। স্টেশন প্রায় অর্ধঘণ্টার পথ।"

হরিনাথও একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

"আপনার শুভনামটি জানা হয়নি।"

"হরিনাথ দাস।"

"আমি শ্রীবৈশ্বানর বিশ্বাস। আপনার সাথে বাক্যালাপ করে প্রীত হলাম। আজ বিদায় দিন। গাড়ির সময় হয়ে এল।"

কতক্ষণ একভাবে চাতালে বসে আছে খেয়াল নেই হরিনাথের। যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে। একসময় মনে হল রাতটা খুব ঘন হয়ে উঠেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। চারিদিক নিকষ কালো। দুটো হয়তো বেজে গেছে।

পদ্মঘাটা বেশ খানিকটা পথ। হরিনাথ ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি মুখে দিয়ে জ্বালাবার জন্য বুক পকেটে হাত দিতেই চমকে উঠল। সাথে সাথে মাটিতে বসে অন্ধকারে চারপাশ হাতড়েও পেল না। চাতালে যেখানে বসেছিল সেখানেও নেই।

একটা জোরে শ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে সে আবার বসে পড়ল। এতদিনে এই প্রথম চোখ দিয়ে জল নেমে এল তার।

বাড়ি ফেরার সময় টিনটা বৈরাগীর দরজার সামনে রেখে দিল হরিনাথ।

# सपनें

**साधना तिवारी**

चलते-चलते अचानक शिवेन को ऐसा लगा कि उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हाथों में जो कागज था उसे पार्क की बेंच पर ज़ोर से पटकते हुए, वही पर बैठ गया। पार्क लगभग खाली था। एक-दो बच्चे झूला झूल रहे थे। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। थोड़ी देर आँखों को मुँदें वो चुप-चाप बैठा रहा। तभी जेब में रखी सेलफोन की घंटी बजी, पर वो अपने विचारों में खोया रहा। घंटी बंद होती और फिर बजने लगती। उसे पता था कि इस वक़्त माँ फोन कर रही होगी पर वो अभी उनसे बात करना नहीं चाहता था। उसने कॉल काट कर सेलफोन को स्विच ऑफ कर दिया। हवा के झोके से कागज जमीन पर गिर चुका था, उसने कागज को उठाया और फिर से ध्यान से देखने लगा। इतने कम मार्क्स.. आँसू उसकी आँखों से झर-झर बहने लगे। पढ़ाई के लिए ही वो घर से इतनी दूर यहाँ रह रहा था। माता-पिता, भाई-बहन, सभी ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे यहाँ भेजा था। बचपन से ही पढ़ाई, खेल कूद में अव्वल रहने वाला शिवेन सबकी आँखो का तारा था। उसे जीवन में कुछ बनना था। उसे आज भी वो दिन याद आया जब वो पहली बार अपने पिता के साथ इस कॉलेज में आया था। हॉस्टल में सामान रखने के बाद जब पिताजी जाने लगे तो उसकी आँखों में आँसू आ गए थे।

धीरे-धीरे पढ़ाई आरंभ हुई और वो उनमे ऐसा व्यस्त हुआ कि सब भूल गया। उसे घर की याद आती तो वह खुद को यह कह कर समझा लेता कि पढ़ाई खत्म होते ही वो उनके पास पहुँच जाएगा। कितना गर्व होगा उन्हे। देखते-देखते दो साल निकल गए। यह उसका कॉलेज में अंतिम साल था। पहले सत्र की पढ़ाई आरंभ हो चुकी थी। एक दिन उसे तेज़ बुखार आया एवं उसके बाद अक्सर सिर में तेज दर्द रहने लगा। माता पिता आकर उसे घर ले गए। धीरे-धीरे वो काफी कमजोर होता जा रहा था। यहाँ आकार इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो गया। उसके माता-पिता उसे घर पर कुछ दिन और रखना चाहते थे पर परीक्षाएँ सिर पर थी। लौट कर परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। उसने काफी मेहनत की। रिजल्ट वाले दिन वो काफी पेरशान था। रिजल्ट निकलने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। सारे विषय में उसके कम मार्क्स आए थे और एक विषय में वो फ़ेल भी हो गया था। उसके शिक्षकों एवं मित्रों ने समझाया कि अगली बार वो और मेहनत करे। लेकिन शिवेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिज़ल्ट हाथ में लिए निकल पड़ा। उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। पहली बार फ़ेल हो जाने का एहसास उसे अंदर से तोड़े जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा।

बेंच पर बैठे-बैठे शिवेन को काफी वक़्त हो गया था। वो उठ कर कुछ आगे की तरफ बढ़ा होगा कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक फल बेचने वाला लड़का कागज उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था कि क्या यह कागज उसका है? शिवेन देखते ही समझ कि यह उसका रिज़ल्ट था जो अनजाने में ही बेंच पर रह गया था। उसने कागज उसके हाथ से लगभग छीनते हुए उसे अनमने मन से शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। "रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ क्या?" पीछे से किसी ने कहा। शिवेन चौंक कर पीछे मुड़ा तो देखा कि वही लड़का कह रहा था। "ऐसा कुछ भी नहीं है" कहते हुए वो आगे की तरफ देखने लगा। "तुम कहो या न कहो मुझे पता है कि इसीलिए उदास हो" उस फल बेचने वाले लड़के ने कहा। अब शिवेन ने थोड़े गुस्से से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना काम करे और उसे अकेला छोड़ दे और वह आगे बढ़ गया। पर वह लड़का उसके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख कर शिवेन को गुस्सा आया। वो आगे जाकर एक बेंच पर बैठ गया और दूसरी तरफ देखने लगा।

वो लड़का भी उसके पास आकर बैठ गया। शिवेन ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा — तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? क्यो मेरा पीछा कर रहे हो? अकेला छोड़ दो मुझे। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और केवल उसकी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस लड़के ने कहा कि — मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें देख कर समझ गया कि परेशान हो। फिर जब ये कागज का टुकड़ा उठाया तो समझ में आया कि बात क्या है। यह सुन कर शिवेन अपने आंसू रोक नहीं सका और कहा कि अब वह अपने सपने को शायद कभी पूरा नहीं कर पाएगा। यह सुन कर वह फलवाला लड़का थोड़ा मुस्कुराया और उसने पूछा — क्या ये तुम्हारे जीवन की आखिरी परीक्षा है?

शिवेन : नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगाता कि फ़ेल होने के बाद मै आगे पढ़ पाऊँगा..

लड़का : बचपन में मै पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। दसवी के रिज़ल्ट निकलने से पहले ही पिता का देहांत हो गया। परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे कंधो पर आ गई। पढ़ाई छूट गई। सपने तो कब के पीछे छूट गए। लगा अब कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा।

शिवेन : फिर?

लड़का : पिताजी फल बेचा करते थे तो मैंने भी घर चलाने के लिए फल बेचना शुरू किया। शुरू में तकलीफ हुई फिर धीरे-धीरे काम सीखने लगा। अब तो अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ ही दिनों में दुकान खोल लूँगा। बस अब आगे बढ़ना है।

शिवेन : तुम्हें दुख नहीं होता?

लड़का : शुरू में लगता था कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए है। मै असफल हो गया हूँ। पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए जाना कि छोटी-छोटी बाधाएं तो राह में आती ही रहती है। उनसे डर कर हम आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ सकते। एक छोटी सी असफलता हमारे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। अब तो मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की सोच रहा हूँ।

शिवेन : जरूर करना। मुझे उम्मीद है तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी।

लड़का : तुमसे बस यही कहना चाहुँगा कि जीवन में बाधाएँ तो आती ही रहेंगी, बस तुम अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना।

यह सुन कर शिवेन को समझ आया कि वो बेकार ही इतना परेशान हो रहा था। उसने उस लड़के को गले लगाया और आगे बढ़ गया।

"The Owl" Susmita Dey

# শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে

**বিষ্ণু দে**

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়, মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে-মন, সর্বদিকে ব্যাপ্তি, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে
সংগীতে; অথচ নিত্য জীবনসম্ভোগে, এমন কি জর্দা-পানে,
ধূমপানেও—কিংবা ধূমপান ছেড়ে! বয়স্কের মামুলি বিজ্ঞতা,
এ-জগতে প্রজ্ঞার যা বেশ, সেই যথোচিত ভারিক্কি মাহাত্ম্য,
সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আত্মপ্রীতি নেই; নেই কিছু বর্জনের নীতি।
সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,
প্রবল বাঙালি এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য।

জিজ্ঞাসার অন্ত নেই — দুর্গম শূন্যের তত্ত্বের তথা দৈনন্দিনে
সন্ধিৎসা প্রখর সদা, জানি না এ-অতিমস্তিষ্কের জটিলতা।
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা নির্বিকার প্রসাদ সাত্ত্বিক।
অথচ হৃদয়বত্তা দুর্লভ নির্বোধে মূর্খে, সত্তা বেচে কিনে
যাদের প্রত্যহ যায়, তাই বিশ্বে কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।
এ-জাতক শৈশবেই প্রতিভায় মহাপ্রাজ্ঞ, শতজন্মদিনে
জরা কেশাগ্রেই ক্ষান্ত; সপ্ততি শিশুর শতবর্ষ স্বাভাবিক।

# On the Seventieth Birthday of Satyendra Nath Bose

**Bishnu Dey**

To know him is a triumph of the mind, a great human experience
Wondrous is the mind, spread out at every direction, in arts literature science
Music; yet in the enjoyment of everyday, even in spiced-betel-leaves
And in smoking—or even in giving it up! Common wisdom of the aged,
What is the apparel of prudence in this world, that apt majesty,
The old man, achiever of his goal, but no self-love; no principle of rejection.
Universal harmony rested on all subjects and all beings
A Bengali to the core, yet to this universal man none is alien.
Endless queries — in the theory of space or matters mundane
Desire for search is ever keen, I don't know the complexities of this super-brain
Where has it found its self-oblivious, unaffected saintly gratification
Yet rare cordiality to the stupid and the ignorant, putting their hearts on bargain
Whose life is spent every day in buying and selling existence,
That's why there is scheming hatred and greedy wickedness.
A wonder at the cradle, this babe is a wizard genius, while birthdays pass
Palsy is arrested at the tip of the hair; for this seventy's child a centenary is only natural.

Note : The poem was composed on 10 December 1963 and published in *Parichay*, Magh 1370 BS, January 1964

**Translation :** Sunish Deb

**Acknowledgement :** Dr. Ramkrishna Bhattacharya

# সত্যি ও বিস্ফোরণ

**সঞ্চারী গোস্বামী**

সত্যি কথা বলতে গেলেই পেটের ভেতরটা খালি খালি লাগে—
আজকাল;
ঠিক যেন নাগরদোলা থেকে পড়ছি আর পড়ছি
কত নীচে পড়ছি তা বোঝার শক্তিটুকুও নেই।
অথচ জানি
মিথ্যে দিয়ে গড়া এই মাটি, এই বাড়ি
এই জীবন, এই সাতসমুদ্র, এই বাড়ি
এই জীবন, এই সাতসমুদ্র, এই তেরোনদী
সমস্ত — সমস্ত—
সেঁধিয়ে যাবে মহাকালের পেটের ভেতরে
এক বিন্দুতে।
বিস্ফোরণ না হলে
বাঁচার আশা নেই।

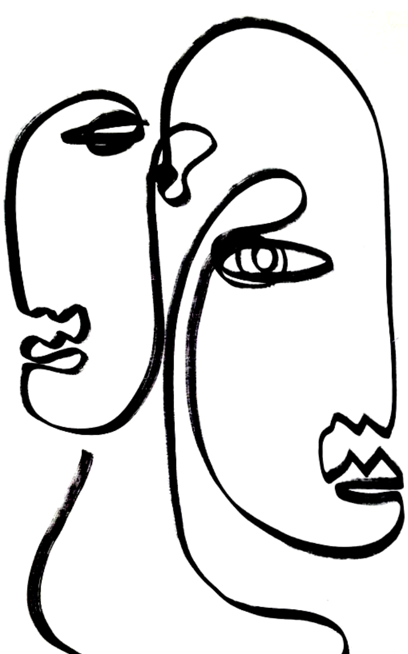

# স্রোত

**বিপ্লব ভট্টাচার্য্য**

ডানপিটেদের রাত কাবারি, রক্তজমা ইস্তেহার,
রাত বিরেতে ডাক প্রহরীর, 'জাগতে রো- খবরদার'।
যে যার মতো গড়ছে খবর, রাখছে ল্যাজা ছাঁটছে আঁশ,
নিদ্রা চোখে জাগছে মানুষ, উড়ছে ধুলো, রুদ্ধশ্বাস।

ঘড়ির কপাল ছুঁয়ে গেছে গুলি, কাঁটা ঘুরলেই রণ,
স্নাতক পথে, বিছানায় শব, সবাই আপনজন।
দোদুল্যমান চিড় ধরা শির, যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ছে,
বাঁচার আশায় দিন দিন সব, মরছে অথবা মারছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে, পড়ে আছে ডাল-ভাত মাখা,
হাওয়া দিলে তবু ওড়ে আকাশেতে ছিন্ন পতাকা।
বাঁধ ভেঙে ধস নামে, পড়ে থাকে ঝুরঝুরে বালি,
আকাশেতে তবু ওঠে সুন্দর চাঁদ একফালি।



Contents

# ছায়ালোক

**চৈত্রালি সেনগুপ্ত**

তার বয়েস, ধরে নেওয়া যাক, খানিকটা ঢলেই পড়েছে পশ্চিমের দিকে —
অনেক বড়ো বাড়িটায়, যে ক'জন অবশিষ্ট আছে,
সকলকে দেখে শুনে রাখা,
কখনো বা ফুলগাছ, কখনো বোনের সেতার,
কখনো বা বাহারি লণ্ঠনটিকে সাফসুতরো রাখা,

কোনো একদিন, কোনো এক সুদূর অতীতে, প্রিয় বান্ধবীকে সে বলেছিল,
''ভালোবাসা এমন একটা কিছু, যা ভালোলাগার ডালি উজাড় করে দিলেই সে পৃথিবীর তুঙ্গে,
আর যন্ত্রণা দিলে ... তা সহ্যের অতীত''
তারপর কখন পাশের বাড়িটি হয়ে গেছে পশ্চিম গোলার্ধ
এখন আবার অনেক দূর থেকে চিঠিপত্র আসে
কখনো লেখা থাকে সেখানে, ''আপনার নামটি পুরনো কিন্তু মিথ্যে নয়''
তাকে নিয়ে আরো কত নানা কৌতূহল
সে সব চিঠিদের উত্তর লিখতে লিখতে শিউরে ওঠে সে,
এই কি তবে নিজেকে চেনার বাকিটুকু!
সব অন্যরকম এখন,
প্রেমের মানে অতীব নিজস্ব এবং গোপন এ সময়, ...
.................
বান্ধবীটির বিয়ে হয়ে গেছে........

অনুপ্রেরণা : ''অসময়'' — বিমল কর

# সমুদ্র

**সুচেতা মন্ডল**

গভীরতা দানা বেঁধেছে আমার মর্মে,
স্নিগ্ধতা আমি নিঃশ্বাসে বয়ে যাই,
একাকীত্বর জন্ম ঝিনুক গর্ভে,
উচ্ছ্বাস পাবে বালু কিনারায় ঠাঁই।

রামধনু আঁকি বাষ্পের ঘেরাটোপে,
রবিরশ্মির তীব্রতা করে ম্লান,
পরিযায়ীদের আশ্রয় খুঁজে ফিরি,
ঊর্মিমালায় ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণ।

মিলনমেলা মিলেছে যে মোহনায়,
আমি যেন তার রাত্রিদিনের গল্প,
কত আসে যায় নাবিকেরা দিগভ্রান্ত—
চিনতে তাদের পারিনি যে শুধু অল্প।

আমি মহাকালের প্রলয় হতে ভিন্ন—
শান্ত শ্রাবণে উদ্বায়ী জলাধার,
যারা মনোযোগ করতে চেয়েছে ছিন্ন,
স্থান-কাল ভেদে রয়েছি নির্বিকার।

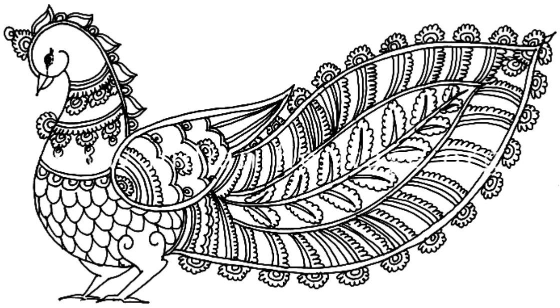

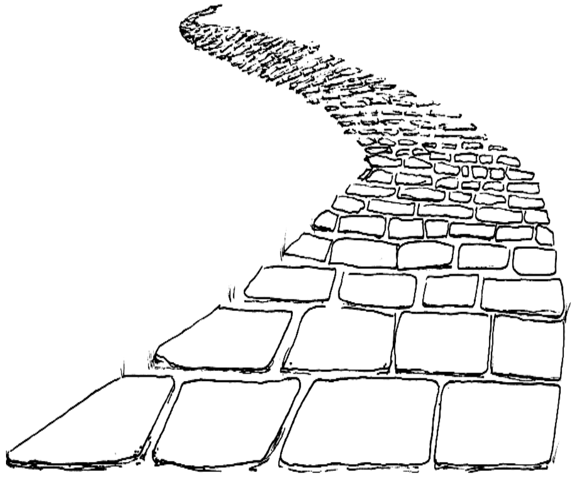

# বিশুদ্ধ এক গানের জন্য

**অঞ্জন বর্মন**

গানের কাছে হাত পেতেছি সকাল সন্ধে
সেদিন আমার মন ছিল না জ্ঞানসমুদ্রে
কাটছি কলেজ দিল দিওয়ানা ট্রেনের জানলা
উদাস বিকেল আলো ছড়ায় বাদামওয়ালা

বেহাগ না কি মল্লার এই তর্কদুপুর
বুকের নূপুর ঝরিয়ে দিত একলা ছাতে
মনখারাপের দুষ্টু ঘুড়ি—নে পাখোয়াজ
গাড়িয়াল ভাই আস্তে চালাও—ও ভাওয়াইয়া

বিশুদ্ধ এক গানের কাছে হাত পেতেছি
তখন তোমার চলতি হাওয়ায় কেউ ছিল না
আগুন কিংবা কাপালিকের পিশাচসিদ্ধ
উপন্যাসের পাতা খুলে দূর দিগন্তে

সুরের আশায় দাঁড়িয়ে একা ছাতিমতলা
খোয়াই থেকে কোপাই কাঁপছে ফাগের আগুন...

# নির্জনলিপি

## অঞ্জন বর্মন

### হে মানুষ...হে ঈশ্বর...

নিবিড় অশ্রু গিলে কোন শক্তি করেছ সঞ্চয়?
হে মানুষ, এ নীরক্ত অন্ধকারে
কবিতাও নতজানু হয়
অক্ষর ছড়িয়ে পড়ে অভিমানী ঘাসে
হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্টির আলো
চোখ ফেটে ঝরছে আকাশে...

### বৃষ্টিদিন

আমার বৃষ্টিদিন নিবিড় বেদনাগ্রাহী
টুকটুকে আঙুরের মতো
মুখে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো এক পাখিজন্ম
ফেলে রেখে যাচ্ছে সব ক্ষত...

### পাখির হৃদয়

পাখির হৃদয় থেকে কবিটুকু কেড়ে নিয়ে দেখি
সে কেবল উড়ে যায়, ডানাজোড়া মেলে না একাকী
কবি তার ডানা মুড়ে সারাদিন জানালায় বসে
আকাশ নিরভিমান, তবু সে নির্মাণ করে শেষ....

### অতীতকে মুছে দিয়ে...

অতীত সামনে এলে পুনরায় নবাগত ভোরে
আমিও তুলে নিই কলম ও লাঙল দুই হাতে
এক আঁজলা অশ্রু ও একমুঠো দীপ্তি জড়ো করে
শুরু হোক যজ্ঞাগ্নি মহীনের ঘোড়াদের সাথে...

### এই স্বর্গ যথেষ্ট আমার

একচিলতে অনন্ত ছুঁয়ে বাকি পথ সীমানাতে ঢাকি
একডুব বেদনায় দিয়ে বাকি জন্ম খুঁজি সুখপাখি
তুমিও সত্য ভুলে ভেবে নাও এই স্বর্গ যথেষ্ট আমার
দিনান্তে শকুনেরা পাক মারে মাথার উপর চক্রাকার...

### বিভাবরী

সকল বেদনায় উৎসমুখে মুখ রাখি
সকল হর্ষের হ্রস্বসুখে আমিও একাকী
আনত চিহ্নের দাগ মুছে গেলে তুমি বিভাবরী
জন, অনন্ত, আলো — আর সমস্তটা ফাঁকি...

# শিরোনামহীন

## ইজাজ তারিফ

আকাশের ওই কালোমেঘে
সব বিষ দাঁতে আজ বিষ শেষ
ছিঁড়ে ফেলা প্রেমপত্রের
যত লাল দাগ ছিল রক্তের।
সীমাহীন দীর্ঘশ্বাস

মৃত আজ সেই বিশ্বাস...

ঘন কুয়াশায় দেখি ছায়ামুখ
নির্বাক সে নিশ্চুপ
ভাঙা দরজায় স্মৃতি হাতড়াই
বীর সেনাপতি যেন ভিক্ষুক।
সীমাহীন দীর্ঘশ্বাস

মৃত আজ সেই বিশ্বাস...

কালো চোখেও আজ মায়া নেই
ধু ধু বালি মরুছায়া নেই
যত জল ছিল আজ ঘোলাটে
তবু দোষ দিই আজ ললাটের।
সীমাহীন দীর্ঘশ্বাস

মৃত আজ সেই বিশ্বাস...॥

## নিয়তি

**ইজাজ তারিফ**

আজও,
কালি মেখে থাকে মেয়েটি
দুটি চোখে শুধু স্বপ্ন।
নোনা জলে ভেজে বাস্তব
হার মানে হৃদস্পন্দন।
রং চটে গেছে দেয়ালের
বাতি কেরোসিন শূন্য।
জীবন বৈশাখী ঝঞ্ঝায়-পোড়ে,
তবু হাল ধরে থাকে দৈন্য।
হাতের মুঠোকে বালি ফাঁকি দেয়
তাই হাত পেতে ভিক্ষা।
দুর্বল জপে নতজানু করে
নোট ছাপানোর শিক্ষা।

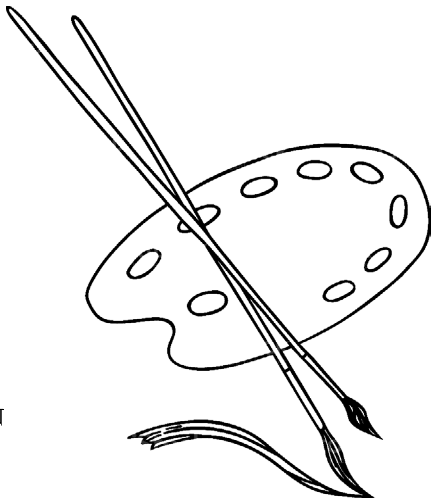

## এত আঘাত দিও না, প্রিয়

**সুনীশ দেব**

এত আঘাত দিও না, প্রিয়,
সইতে পারব না।
ভুল-ঠিক আর ঠিক-ভুল
এই দিয়েই তো
জীবনের মাদুর বোনা।

এসো কাছে, আরও কাছাকাছি
চলো সেই মাদুর পাতি
ভুলকে ঠিক দিয়ে ঢাকি।

তার পরেও যদি থাকে কিছু
বেহিসেবি, ভেসে থাকা ভুল
ঠিক-পুকুরের টলটল কোল জুড়ে
ডুবুরি নামিয়ে দেখো
ঠিক খুঁজে পাবে
ভরা কলসি, দড়ি
আর ভুলের মাশুল।

## মন-কেমন

**কৌস্তুভ দত্ত**

তোমার তুলির টানে আমার স্বপ্নেরা আজ রঙিন
দেখা পাওয়ার আশায়, অবুঝ ইচ্ছেরা গুনেছে দিন
তোমার ইশারায়, ঠোঁট কথা হারায়,
অভিমান আজ দিগন্তে বিলীন....

কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও? কোন কথা বলে যাও?
নিমেষে কল্পনায় উড়ে যাও!
অচেনা কোন ব্যথায় গিটারে ঝড় ওঠায়
মনকেমনের শেষ বেলায়...

# আনমোল মতি

**সহিদুল ইসলাম বিশ্বাস**

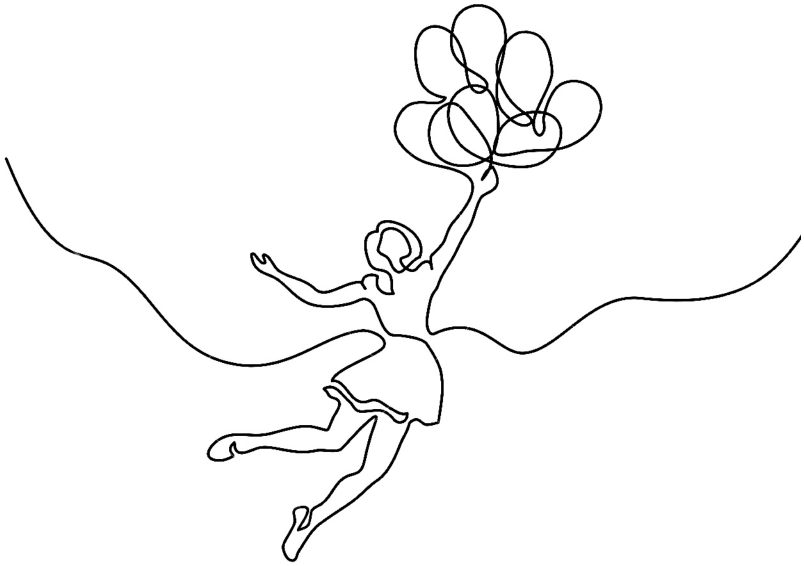

সুখ কি কভু যায় রে কেনা
হাটবাজারের গলিতে?
দু-এক টাকায় কিনে নিয়ে তায়
ভরে দেব তোর ঝুলিতে?

ফুল ফোটে বলেই তো
প্রজাপতি সেথা ধায়।
মিলন আছে তাই
মানুষেরা প্রেম চায়।।

জীবন গেছে যার হেলাফেলায়,
সুখ নাই যার ভালে,
কী হইবে জপিলে মালা
মরণের কালে?

# এই তো জীবন

**সহিদুল ইসলাম বিশ্বাস**

জীবনের প্রতি পলে এসে যায় বাধা
বাধা কে এড়িয়ে যায় কার সাধ্য
সাধ্য থাকলেও হাজির হয় অন্য রূপে
রূপ তো প্রত্যেকের আছে
আছে তো সবার ধন সম্পদ
সম্পদ থাকলেও কেন থাকে না সম্মান?
সম্মানই তো বড়ো জিনিস পৃথিবীতে
পৃথিবীকে চিনল কে?
কেই বা মর্যাদা দিল সৃষ্টিকর্তার?
কর্তাকে তো ঘরেও মানে না।
মানে না বলেই মানুষের আজ এ অবস্থা
অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়াই ভালো
ভালো মা'কেও ভালোবাসা
ভালোবাসা দেওয়া যায় সবাইকে
সবারই উচিত সৎপথে বাঁচা।

# আঁধার

**নির্মাণ গাঙ্গুলি**

ছোট্ট শিশুর মনে যখন
স্বপ্নেরা মেলে ডানা
বাস্তবের পরিহাস এমন
মানুষই তখন দেয় হানা
ভয় এঁকে দেয়
মনের গহনে যেই মানব
আজও বাসা বেঁধে আছে
প্রাচীন সেই দানব
ফেরেনি এখনো হুঁশ
মেটেনি এখনো সে বাসনা
ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলি
মানুষ নামক ভাবনা।

# আশীর্বাদী পথ

**ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী**

আমিও হেঁটে যাব,
যে পথে সিদ্ধার্থ গেছেন বুদ্ধরূপে,
আশীর্বাদী পথ —
পাথরের ভিড়ে ফুল ফুটে থাকে;
আরণ্যক পাখির ডাক,
দিবারাত্র ছুঁয়ে যাবে আমায়।
শর্ত নেই আর কোনো খেলাঘরে
'জীবন' মানে—
খুঁজে পাওয়া গেছে।

# প্রয়াস

**নির্মাণ গাঙ্গুলি**

আলোচনা যখন গম্ভীর
প্রসঙ্গ যখন শিক্ষা
ডরাবে কেন সেই মানুষ
প্রকৃতির কাছে যে নিয়েছে দীক্ষা
বাতাসের কানে কথা বলেছে সে
বটবৃক্ষের তলায় নিয়েছে শ্বাস
পদ্মপাতার জল স্পর্শ করেছে সে
নদীর বালুচরে বেঁধেছে নতুন আশ
খেতের মাঝে গিয়েছে যখন
নিয়েছে মাটির আঘ্রাণ
সুরভি যার আনে জোয়ার
জুড়ায় যে প্রাণ
মেঘ যখন ঘনায় আকাশে
তার সাথে দেয় সে গর্জন
শিক্ষা নেয়নি কিনে সে কখনো
করেছে সে অর্জন
তমসাময় শিক্ষা যখন
কুরে খায় তাকে শিক্ষাখেকোর দল
বিধাতার লেখন মুছবে সে, গড়বে সোপান
অসীম শক্তির প্রয়াসে আনবে নবসৃষ্টির বাদল

# এই সময়

**অর্ণব শীল**

একা একা থাকি একা একা কথা বলি —
হরমোনের আবেগ নিয়ে যায় কখনো কালীঘাট আবার কখনো পার্ক স্ট্রিট,
আবেগের হরমোন আজ বলে নন্দন কাল বলে প্রিন্সেপ ঘাট।
উৎসবের উল্লাস কখনো Madox স্কোয়ার তো কখনো বাগবাজার...
উল্লাসের উৎসব আজ ব্রিগেড থেকে মেট্রো চ্যানেলে।
অভিমানী প্রেয়সী বলে গোলপার্ক to গোলবাড়ি নইলে আড়ি তাড়াতাড়ি,
প্রেয়সীর অভিমান মোটে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ॥
বৃষ্টির শহর ভেজায় ময়দান ভেজায় নবান্ন
শহরের বৃষ্টি ভাসায় ঠনঠনিয়া কাঁপে বেহালা।
একা একা থাকি একা একা কথা বলি —

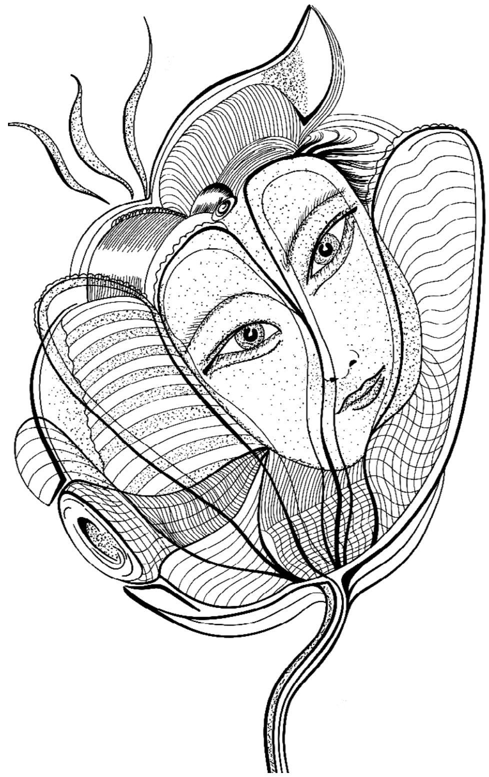

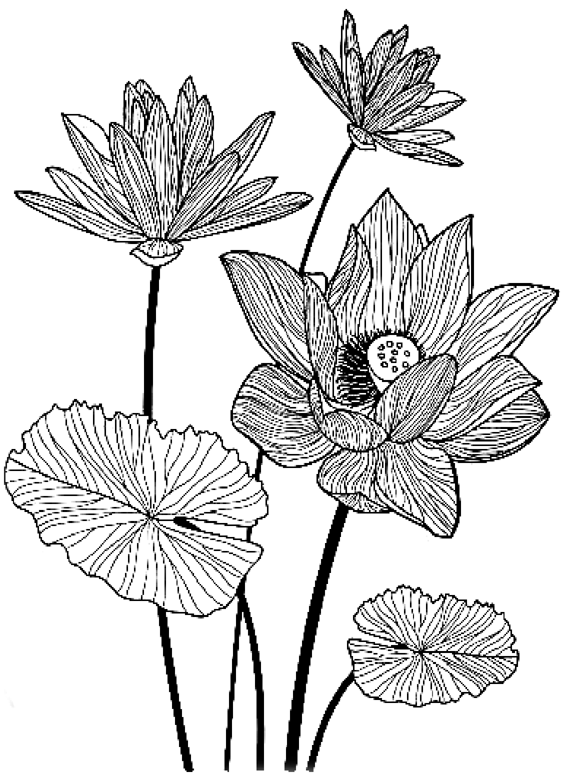

# গর্বহীন উত্তর

**অর্ণব শীল**

বাগবাজারে আমার মা, সিমলাতে আমার বিবেক।
জোড়াসাঁকোয় আমার কবি, জোড়াবাগান আমার নিজের।
হেদুয়াতে আমার কফি হাউস, হাতিবাগানে আমার মহালয়া।
কুমোরটুলিতে আমার ক্যাপ্টেন, শ্যামবাজারে আমার খালি পা।
শ্যামপুকুরে আমার ঠাকুর, আহিরীটোলায় আমার গঙ্গা।
কলেজ স্ট্রিটে আমার জ্ঞান, রাজাবাজারে আমার বিজ্ঞান।
তাও নেই দম্ভ তাও নেই গর্ব এটাই আমার উত্তর।

# জীবনের হিসাব

**অমৃত কুমার মণ্ডল**

সাল ২০১৮, .....
এই সময়ের কিছু আলো অন্ধকারের খেলা,
আর কিছু জীবনের অঙ্কের হিসাব, আমাদের সমাজকে
বিষাক্ত করে তোলে।
আমরা মানুষেরা নিজেদের আত্মসম্মান নিয়ে ব্যস্ত থাকি খুব।
ভাবি— যদি হারায়, যদি হই শকুনের মতো!!
আমরা চাই অপরের থেকে নিজেকে বড়ো বা সম্মানীয় প্রমাণ করতে।
কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছ কি!!
যখন তুমি বড়ো রেস্টুরেন্টে যাও
১০০-২০০ টাকা বকশিশ দিলেও তোমার গায়ে লাগে না,
আবার খাবারের দাম থাকে আকাশ ছোঁয়া।
আর আমাদের অনেক মূল্যবান সময়ও করে দেয় নষ্ট,
এখানে অবশ্য সময়ের কথা মনেই... থাকে না।
আর নিত্যপ্রয়োজনে যদি যাও চাল, ডাল বা সবজির বাজারে
কোথায় যায় তোমার সম্মান?
কেন করো এত দরদাম, আবার তারপরও কিছু মূল্য যদি দিতে পারো কম
তাহলে ভাবো নিজেকে মহান!!
আর সময় তো এখানে কোহিনূর, নষ্ট করা যাবে না
হে আমার সম্মানীয় ব্যক্তি, তোমাকে আমার প্রণাম!!!
আসলে তুমি ভাবো জীবনে কোকিল বা ময়ূর হলেও সম্মান বেশি হবে।
কিন্তু ভেবে দেখো কোকিলের বাসস্থান বা ময়ূরের খাদ্যস্থান কি?
আর এরপর যদি আস শকুনের দিকে, তোমার সুস্থ জীবনের জন্য
বা সুন্দর অনেকটা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য এর অবদান কিন্তু বাকিদের থেকে কম না।।
তারপর আরো আছে জীবনের হিসাবে, হোক না তা নারীর সম্মান বা শিশুশ্রম।
মুখে আমরা অনেক কিছু বলি কিন্তু কাজ করতে গেলে যদি
এতটুকুও কাজ করি, তার বিনিময়ে সম্মান চাই কিন্তু অসীম,
যেন আমি একমাত্র, যার উপর আর কেউ নেই।

জানি না জীবনে চলার পথে স্বামীজি বা নেতাজির মতো মহামানবের দর্শন মিলবে কিনা?
তবে জীবনের হিসাব ব্যবহার ও কর্মফল দিয়ে ঠিক হবে
তুমি নিজেকে কোথায় রেখেছ তার উপর নয়!!!

# (ভালো) বাসা

**কেশব কর্মকার**

বলতে পারো,
ঠিক কীভাবে বাসতে পারি?
তুমি বলবে খারাপ না ভালো।

ঠিক যেভাবে বৃষ্টি ভেজায় পাহাড় মাটি।
মাঠের পর মাঠ, গাছের পর গাছ ভিজিয়ে
খরস্রোতায় একলা নদী

হ্যাঁ। পড়তে পারি বৃষ্টি হয়ে, তোমার গায়ে।
তবে আমায় সময় দিও।
দেরি অনেক . . .
মেঘ জমাব বুকের ভিতর
একলা নদী অনেকটা পথ।

মিশব তোমার সাগর জলে।

ঠিক বলেছ, যেমনভাবে কাশের গুচ্ছ
হাওয়ায় দোলে, আর আকাশ নীলে হারাও তুমি
যেমনভাবে শিউলি টগর ভোরের বেলা,
তোমার পায়ের নরম তোড়া। হাঁটবে পথে?
জমবে শিশির (হয়ে) ভোরের বেলা,
রাগ ভাঙাতে আলোর ছোঁয়া,
রোজের মতন। এখন আমার সঙ্গে আছ?

হ্যাঁ।
সঙ্গে আছি বলেই তুমি,
মিলিয়ে গিয়ে, ভালোবাসতে পারো?

বাবার মতন! ঝড়-ঝাপটা আটকে দিয়ে,
সঙ্গে আছি। কড়া চোখের শাসন মাঝে
রোজ বায়নায় খেলনা পুতুল।
কান্নার জল ভিজিয়ে নিয়ে বাবার আঙুল,
পাশেই আছি, কী প্রয়োজন?
মিটিয়ে দিয়ে। খুঁজবে আমার রাজার কুমার।

যেমন ভাবে মায়ের আঁচল আমার ছায়া,
ভয়ের শেষে। ঠিক যেভাবে
মায়ের হাতের নিপুণ কাজে
আমার চুলে তেলের ছোঁয়ায়,
আমার চুলের বাঁধন দিয়ে
লাল সবুজে ফিতের সাজে,
আমার মাথায়। পারবে তুমি?
মায়ের দেওয়া কাজল, চোখে।
নজর কাটে কালো ফোঁটায়, মাথার কোনায়।

হ্যাঁ! আমিও পারি, তবে অন্যরকম।

মান অভিমান মিটিয়ে দিয়ে
যেমন তেমন বাসতে পারি।
আরও বেশি। আগের আমার গল্প হবে?

গল্প হলে, রাজার রানি
সাজতে পারি।
সাজতে পারি সোনাদানায়।
ভাসতে পারি রোজ বিকেলে
তোমার সাথে, দিঘির মাঝের জলকেলি
আর দাসীর মাঝে পাহারা দেওয়া
বিঘেয় বিঘেয় আরাম ঘর
রাখতে পারি, আগল খুলে।

মহল ভুলো, আমার সাধ্যি মতন
সাজাতে পারি রানি, তবে
রাজা আমি, আমার কুঁড়েঘরের।
সাজতে পারো নিজের মতন।



Contents

আমার উঠোন মালতি, চাঁপা, গাঁদা ফুলের।
ইচ্ছে মতন গোলাপ তুলে
পরতে পারো খোঁপার চুলে
রোজ বিকেলে, পায়ের কাছে ছোট্ট নদী
সৃষ্টি সুখের মিলনস্থলে, আঁধার হলেই
কুঁড়ের চালে পাহারা দেবে
তারার মাঝে চাঁদের আলো,
বাসতে পারি তোমায় ভালো।
ঠিক যেভাবে গল্প হলে,
একটা জীবন, বাঁচব আমি
তোমার সাথেই একটা জীবন।
কান্নাকাটি সুখের মাঝে,
তোমার গালে হাতের ছোঁয়ায়!
বলতে পারি ভালোবাসি ভালোবাসি।

# একটি গাছের আত্মকথা

**অরুণাভ আদক**

কালিন্দী নদীর তীরে      শাল-পিয়ালের ভিড়ে
আঠারো বছর ধরে আছি শাখা মেলে।
শুনেছি নদীর গান,      পাখিদের কলতান
জানি না স্বাধীন হব কার দেখা পেলে।
নব বরষার জলে,      ধরণীর ভূমি-তলে
বীজ হতে উঠেছিল প্রাণের অঙ্কুর।
তমাল নাম যে মোর      আঁধার তো নয় ঘোর
অশ্রুসিক্ত মাটি হয়েছে ভঙ্গুর।
প্রথম যেদিন আঁখি      তমসাকে দিল ফাঁকি
মেলিলাম দুটি পাতা পরম তৃপ্তি।
পবনের ইশারায়      মন-মাঝি খেয়া বায়,
রক্তিম দিগন্তরেখা উজ্জ্বল দীপ্তিতে!
শরতের আলোকেতে      অরুণের পলকেতে
বলেছিল স্বাগত যে কোন এক বৃক্ষ?
আকুল হতেছে মন      গগনে রবি-কিরণ
কাহার চাহনি মোরে করিছে কটাক্ষ?
হেমন্তের সে আশ্বাসে      মুকুল বাড়ে উচ্ছ্বাসে,
কত কুদৃষ্টি অকাল-বৃষ্টি ঝরিল আমার পর।
সহায় ধরণী      স্নেহের জননী
তাই তো ক্ষতি হল না যে মোর, প্রকৃতিই ছত্রধর
শীতের ম্লান আকাশে      স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে
অনুরণিত হত যে পাতা ঝরার ঝঙ্কার
জাগিছে প্রকৃতি      দেখিছে মালতী
চঞ্চলা নদী ভূমির বক্ষে হাঁসুলির অলংকার
বসন্ত হে ঋতুরাজ      নব কিশলয়ে সাজ
মলয় সমীরে দোলে মোর ললিত লাবণ্য
ভ্রমর পাখ্-পাখালি      প্রজাপতি কাঠবেড়ালি
মুগ্ধ করে যে আমাকে, এ ঊষা অনন্য
তারপর এল গ্রীষ্ম      পুড়ল রূপ ও লালিত্য
করুণ কণ্ঠে রবির কাছে চাইলাম প্রাণভিক্ষা
তৃষ্ণা-ক্লিষ্ট তপ্ত দৃষ্টি      ঝড়ের মেঘেতে নামল বৃষ্টি
বজ্র-কঠোর অঙ্গীকারে নিলাম আমি দীক্ষা
যতদিন বেঁচে রব      মহাদাতা ত্যাগী হব
জীবজগৎ-কে করে যাব দান আশ্রয় হতে সুখাদ্য
শিশিরের শব্দের মতোই      রৌদ্রের গন্ধের মতোই
সন্তর্পণে শুনেছি যে আমি বাতাসের বাঁশিবাদ্য
তারপর এই মিলানবীথিতে      করেছি স্নান স্মৃতির স্রোতেতে
মুকুলিত হবার সে অন্তহীন প্রতীক্ষায়



Contents

বিশ্বসেবার তরণী বেয়ে আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
ছোটোখাটো দুঃখ ব্যথা ভুলে গেছি উপেক্ষায়
ঋতুদের আগমন সময়ের উত্তরণ
ছুঁয়েছি কোমল স্পর্শে, প্রতিটি নিশ্বাসে
বেলা দ্বিপ্রহর ধ্বনিল মর্মর
বিষাদের রং দিচ্ছে দেখা হৃদয়ের ক্যানভাসে
স্নিগ্ধ ছায়ার তলায় মিষ্টি বিকেল বেলায়
কত মানুষের স্বপ্ন-মোহ করেছি যে অনুভব
নিশুতি রাতে শিউরে উঠেছি শান্ত শাখায় চমকে দেখেছি
রক্তলোলুপ খুনি মানবের ভৌতিক গৌরব
ঔষুধি ও আয়ু জ্বালানি, শ্বাসবায়ু
প্রদান করেছি প্রসাদ-বৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জাতির চরণে
মৃত্তিকাকে করেছি ধারণ খরাবন্যা নিবারণ
কনকাঞ্জলি দিয়েছি আমি কত প্রাণের হরণে
দিবাকর ডোবে পশ্চিমেতে গোধূলি বেলার অন্তিমেতে
পথের উপর পড়ে আছে শুকানো আমার কলি।

বহিছে সময় করুণ বিষয়
বুকের বাঁধন খুলে দুখের কথাটি বলি
কালকে প্রভাতকাল ছন্দে দিচ্ছি তাল
হারিয়েছি কল্পলোকে মায়াবি আবেশে
আমি শুনে চমকে উঠি দিবাস্বপ্ন গেল টুটি
গড়ে উঠবে এক আবাসন হেথা অবশেষে
এল এক প্রমোটার বিশাল বপুটি তার
আঁচড়ে আঘাতে নষ্ট করল কত লতা-পাতা
কৃতজ্ঞতা তুচ্ছ করে ভয়াল নেশার ঘোরে
মানুষ যে আজ ভাবছে কেন গাছ ছেদনের কথা
আমি শুধু একা নয় ওরা সব জেগে রয়
যাদের নেত্রে খুঁজছে নিদ্রা আজ মরণের ভয়ে
মুছে গেছে সে নীলিমা প্রভাহীন শ্যামলিমা
ভেসে আসছে মৃত্যুগীত কোন সুর, তাল, লয়ে
প্লাবিত ম্লান জ্যোৎস্নায় নীলচে তারার ঝরনায়
বিমূঢ় আঁধার অন্তরীক্ষতলে
আমার কাটানো শিশির ঝরানো
এই শেষ রাত হয়তো অশ্রুজলে
ওহে মম অন্তর্যামী জানাই তোমায় আমি
মননশীলতা জাগ্রত করো মানব জাতির মর্মে
স্তব্ধ করো এ কু-আয়োজন সৃষ্টিমূলে মোর প্রয়োজন
মানবিকতা প্রলিত করো মানব জাতির ধর্মে

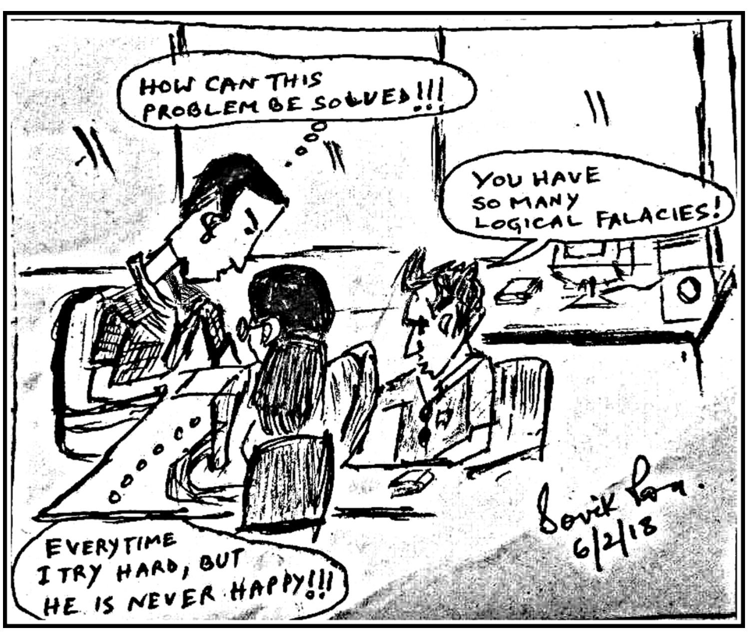


PhD students with their guide Sovik Roy

# গজু ও তার রাগ

**অরিন্দম দাস**

নাম তার গগন পাঁজা, সেখান থেকে গজু।
অদ্ভুত ছেলে, সবই ঠিকঠাক, রাগে না শুধু।
সে রাগতে জানে না, রাগ তার আসে না।
এরকম ছেলে আর কি আছে? যে সব করে, কাঁদে, হাসে, শুধু রাগে না
ছোটোবেলায় তার মা তাকে খুব বকাবকি করেছে,
স্কুলের বন্ধুরা, শিক্ষকরা খুব খেপিয়েছে, হাসাহাসি করেছে,
কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে অপমানও হজম করেছে।
মেয়েরাও ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, ও শুধু শুনেছে,
ও প্রতিবাদ করেনি, করবে কী করে?
রাগই তো ওর আসে না, প্রতিদিন চেষ্টা করে,
কিন্তু রাগ আসে না।
বান্ধবী ওকে ভালোবেসেছিল রাগ না করার জন্য।
কিন্তু ছেড়েও চলে গেছে, অপমানেও না রাগার জন্য।
বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকে সে, করে সামান্য চাকরি।
একার মতো চলে যায় কোনোরকমে, কোম্পানি বেসরকারি।
বস প্রতিদিন গালি দেয়, ছেটোখাটো বিষয়ে অপমান করে
অফিসের কলিগরাও মজা নেয়, ওকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে
বাড়ির মালিকও সুযোগ বুঝে দুকথা শুনিয়ে দেয়
পাত্তা দেয় না, ওর অভিযোগে ঘর সারানোয়।
ও কী করবে? ও যে রাগতে জানে না, রাগ আসে না।
গজু প্রচুর ভেবেছে এটা কি স্বাভাবিক? মনে হয় না।
প্রতিদিন কত মানুষ মিনিটে মিনিটে রেগে যাচ্ছে
রেগে ঝগড়া, মারামারি মায় খুন পর্যন্ত করছে।
কিন্তু গজুর রাগ আসে না।
ও প্রচুর চেষ্টা করেছে রাগ আনার, কিন্তু রাগ আসেনি,
এত অপমান সহ্য করার ক্ষমতা ভগবান ওকে কেন দিয়েছে, ও জানে না।

এভাবেই চলছিল বেশ, কেটে যায় অনেক বছর।
গজুকে ওর অফিসের বস ঝাড়েও অকারণ
ওকে না বকলে, বসের দিন চলে না, আর দেয় হুমকি
কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার, গজু ভেবে চলে এর পরে ও খাবে কি?
গজু সেদিন হাঁটতে থাকে রাস্তায় আনমনে
সামনে প্রতিবাদ মিছিল চলছিল, গজু মিশে যায় সেখানে
পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ চলছে, ও চলে যায় একদম সামনের সারিতে
লাঠি খেয়ে মাথা ভাঙে, জ্ঞান আসে হসপিটালেতে,
গজু দেখে আচমকা ওর ঘরে পার্টির লোক ও বিরোধী দলনেতা
গজু মেলাতে পারে না কিছুই, সবই অস্পষ্টতা
নেতা সব বলে, গজু নাকি খেয়েছে পুলিশের মার
সমস্ত খবরের কাগজ, নিউজ চ্যানেল ওর ছবি তুলছে করেছে পপুলার।
শত প্ররোচনাতেও নাকি পুলিশ মারতে চায়নি ওদের
শাসক দল চায়নি কোনো সুযোগ করে দিতে বিরোধীদের
তাই আজ গজু এত পপুলার, ও হয়েছে হিরো
গজু বোঝে পৃথিবীটা হঠাৎ বদলেছে, ও আর নয় জিরো।
একে একে ফোন আসে বন্ধুদের ও চেনাপরিচিতের
এতদিন পর মনে পড়েছে গজুকে সকলের
বাড়ির মালিক ফোন করে বলে আর ভাড়া না দেওয়ার
যতদিন খুশি ও থেকে যেতে পারে নেই চিন্তা আর।
অফিসের বস ফোন করে ক্ষমা চায়
বলে কালকেই যেন ও আসে অফিসে, প্রোমোশন পাকা তার
বিয়ে হওয়া বান্ধবী ফোন করে শুধু কাঁদে
নিমন্ত্রণ করে তাকে বাড়ি যাবার জন্য, খাওয়াবে নাকি রেঁধে।
গজু ভেবে পায় না কী কাজ করল ও, যে সবকিছু গেল বদলে
তখনি দেখল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ওর ছবি, একটি রক্তাক্ত প্রতিবাদী মুখ,
কী দারুণ লাগছে ওকে রাগলে।

# बेटियाँ

**अंकिता रोजरिया**

बेटियाँ... कितना प्यारा एहसास है न,
नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान छा जाती है,
चंचल, मासूम पर थोड़ी सी जिद्दी होती हैं,
घर आँगन, देश सब इनकी खिलखिलाहट से महकता है,
कभी पिता के घर का तो कभी पति के घर का,
सब का ख्याल होता है इनको।
इन सबके साथ अपने सपनों को साकार करने की जिद भी होती है,
ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियाँ ना कर पायी हैं,
तुम बात करते हो धरती पर नाम कमाने की,
ये आसमान से तारे भी तोड़ कर लायी हैं।
ये वो तूफान हे, जिसके आगे कोई कश्ती ना ठहर पायी है,
जुर्म होते हैं, कानून बनते हैं, शर्मिंदगी महसूस की जाती है,
सिलसिला जारी रहता है।
पर इन्होने अपनी उड़ान नहीं रोकी है,
ये आसमान में रंग बिखेरकर आई हैं तो,
माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा भी फहराया है,
इन्होने जंग के मैदान में बाजी मारी है तो,
खेलों में गोल्ड मेडल भी लेकर आई हैं।
माना इन्हे लड़ना पड़ा, पर इन्होने अपनी जगह खुद बनाई है,
"बेटी बोझ है" इस बात को "बेटी सच्चा मोती हैं, सौभाग्य से होती है" में बदलकर दिखाया है,
इनकी मेहनत, कामयाबी को देश दुनिया ने माना है,
ये सबको साथ लेकर चलना जानती है तो,
जुर्म करने वालों को सबक सिखाना भी।
मेरी कलम भी खुशनसीब है,
जो आज बेटी का जिक्र हुआ है,
शुक्रिया उस खुदा का जो बेटी बना कर भेजा है,
बेटी.. रख सको तो निशानी है,
और खो दो तो बस एक कहानी है,
एक प्यारा सा एहसास है, मस्ती की रवानी है।
इतिहास, भविष्य की अमर कहानी है।
पापा की गुड़िया, माँ की चिड़िया,
दादा-दादी के हाथों की दुआ है,
जिसका कोई अक्षर अधूरा नहीं वो शब्द है बेटी,
देश की आन बान शान और पहचान है बेटी।

# A Tale of Lost Times

**Hrishit Banerjee**

When it rains in my city,
In the midst of scorching, sweltering summers
On evenings, dark and abysmal,
A young soul croons songs of estrangement,
Her voice soft and soothing, she remembers
Night of yore,
Two springtimes back, the pain her heart bore.

When it rains in my city,
On lazy Sunday afternoons,
And the quintessential Bengalis enjoying their sweet siesta,
An old lad dreams of being lost.
Oh no, not at sea,
He remembers how they abused him,
And what dark depression can be.

When it rains in my city,
And the morning sun is hidden
Among dark nimbus clouds which roar,
A schoolgirl, on her way to the nearest bus stop,
Drenched, not only by the incessant wailing of the skies,
In memories,
She just saw her best friend pass, alas!

When it rains in my city,
On deep dreary nights,
And in my hapless stupor, from afar
I see, all the 'World' is lost in sleep,
She comes to me, decked in music and melody,
Calcutta, too dear to my heart,
And the midnight rains in my city.

# Walking on, Perhaps Alone

**Sunish Deb**

Life's but a walking shadow!
Said the bard who but loves life intensely,
And a failed forerunner
Whose soaring sceptre
Loved not life but death
Shadowed by the witches' spur
To the silent darkening shade of the Birnam Trees.

Shadow! Nay, life's but a-walking —
Says an unweary walker,
Walking on, perhaps alone
Walking and trudging along
The path of truth, rarely trod
The warm faith, unfelt often,
Look! Lavinia in the face of death.

Ha! A shadow! Let it be of death
And Charon's collecting coins ...
In the very sea of darkness
The floating fire looks on
Bowing to its father, the Sol.

Walking on, perhaps alone,
The whistling walker sings on still —

Life's but a-walking
And wading through the Hades
Hymning the death of Death.



Contents

# Where the Life Begins to End

**Sk Saniur Rahaman**

He gets some warm wishes and love
When he comes on earth
Then his life begins to end
Just after a few months

After four years of birthday celebrations
The baby turns into a boy
He is being prepared for all types of competitions
Crushing all of his favourite toys

Now he goes to the bed
Usually earlier than ten
Wakes up at around six, and
Has been using his innocent brain

He has come over those high hills
And now preparing to touch the clouds
Ohh, there is an obstacle in his aim
A beautiful face, and her spellbound

He has lost the desire of having her
She has left alone with all his hopes
No way to live anymore
Believe me; absolutely no scope

Now, he is old enough to fight alone
To survive the day, however not the long night
Has started losing his mind and concentration
Confused brain cannot keep up the endless fight

This is not the end dear, this is not the end
This is only the beginning, Where The Life Begins
to End ...

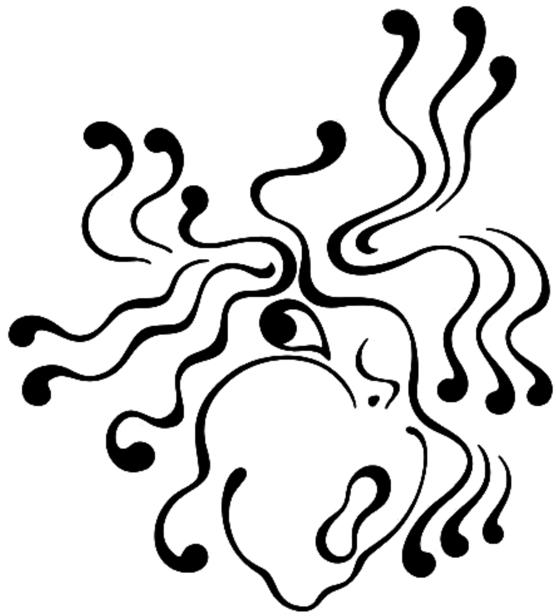

# Momentarily

**Sk Saniur Rahaman**

Things are in the right places,
as usual I am not there,
I wanna climb up the high hill,
looking forward to the stairs.
Plenty of plans in my mind,
necessary to make a proper review.
Although some of those have been done,
while some of those are new.
Well, everyone takes some time,
I am taking a bit long.
Maybe because I don't know much,
I have to learn to be strong.
Don't know where to go,
what it should be.
Whatever be the future,
I wish, I would be happy.



Contents

# ডুয়ার্সের ডায়েরি

**অনুলেখা দে**

এবারেই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকবার উত্তরবঙ্গ বেড়াতে এসেছি। আগে প্রত্যেকবারই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছি। এবারে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি পেরোনোর পর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানালার বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। কখনও চা বাগান, কখনও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে প্রকাণ্ড এই লৌহ সরীসৃপ। কখনও বা পেরিয়ে যাচ্ছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ি নদী। দূরে দেখা যাচ্ছে ঝাপসা ঝাপসা পাহাড়। 'সেবক' পেরোতেই চমক। মন্থর গতিতে তিস্তা পেরোচ্ছে ট্রেন। দুইপাশে ঘন সবুজ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে আপন মনে বয়ে চলা তিস্তা সত্যি মুগ্ধ করেছিল।

বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ নিউ মাল জংশনে পৌঁছালাম। আমাদের নিতে এসেছিল বুবাইদা—আমার এক বন্ধুর আত্মীয়। আগামী কয়েকদিন ইনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং ঘোরাবেন। আমাদের জন্য লাটাগুড়ি তে হোটেল বুক করা আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম 'গজগামিনী' রিসর্টে। পথের অনেকটাই এলাম 'গোরুমারা' জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমাদের রিসর্ট-টাও 'গোরুমারা' জঙ্গলের একদম লাগোয়া। রিসর্টের একদিকে শেষ হয়েছে জঙ্গল আর অন্যদিকে শুরু হয়েছে চা বাগান। ধারে কাছে মনুষ্যবসতি বিশেষ নেই। চারিদিক শুনশান-নিস্তব্ধ। শুনলাম প্রায়ই নাকি এখানে হাতি চলে আসে। শুনেই বেশ রোমাঞ্চ জাগল। "হয়তো বা হাতির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করব"(যদিও তাদের দেখা মেলেনি)।

তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়াদাওয়া করে রওনা দিলাম 'ঝালং'-এর উদ্দেশে। কিছুক্ষণ চা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলার পর শুরু হল 'চাপড়ামারি'র ঘন জঙ্গল। বুবাইদা বললেন যে এই রাস্তায় হাতির পালের সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিছুক্ষণ চলার পর দেখি রাস্তার ধারে লম্বা লম্বা রাবার গাছ আর গাছগুলোর গুঁড়িতে প্লাস্টিক ব্যাগ ঝোলানো। জানতে পারলাম ডুয়ার্সের এই নদী-পাশের এলাকাগুলো চা চাষের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয়। তাই রাবার চাষ এখানকার অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এরপর পাহাড়ি পথে কিছুটা চড়াই ভাঙার পর পৌঁছালাম ঝালং-এর 'গাইরিবাস ভিউ পয়েন্টে'। ঝালং নিজের সৌন্দর্যে নিজেই ভরপুর। পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় 'জলঢাকা' নদীর উপত্যকা। উপত্যকা জুড়ে ভুটান পাহাড়ের উত্থান ঘটেছে। জলঢাকার অন্য তীরে ভুটান। ১০-১৫ মিনিট মুগ্ধ চোখে নীচের উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলা জলঢাকা এবং অন্য পাড়ে ভুটান পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্য দেখে এগিয়ে চললাম 'বিন্দু'র দিকে। চড়াই-উতরাই ভাঙা পাহাড়ি পথে সঙ্গী ছিল শালের জঙ্গল আর মাঝে মধ্যে ছোটো ছোটো পাহাড়ি গ্রাম। এই রুটে ভুটানের আগে শেষ গ্রাম বিন্দু। এখানেও সেই জলঢাকা— পাথরের বিছানার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল ভারত ও ভুটান উভয়ের হিমালয় পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত 'বিন্দু বাঁধ'। 'বাঁধ' পর্যন্ত যাওয়া অনুমোদিত নয়। তাকে দেখতে হয় দূর থেকে। সামনে নদীর ওপারের পাহাড়টা আর তার ওপরের ঘরবাড়ি স্পষ্ট দেখা গেলেও তা আমাদের দেশ নয় – বিদেশ, ভুটান। একই পাহাড়, একই সবুজ — সবকিছুই একই সুরে বাঁধা। প্রকৃতিতে কোনো বিভাজন নেই — শুধু মাঝখানে মানুষের তৈরি সীমানা। নদীতীরের পাথরগুলোর উপর বসে পাহাড়ঘেরা এই নদী উপত্যকার সৌন্দর্য কিছুক্ষণ উপভোগ করে, একটা রেস্টুরেন্টে মোমো খেয়ে পরের গন্তব্য 'রকি আইল্যান্ড'-এর উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ এবং বিপজ্জনক। রাস্তার দুধারে ডুয়ার্সের জঙ্গল। গাড়ির গতিও খুব কম। যখন গন্তব্যে পৌঁছোলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হব হব। শেষ বিকেলের নেমে আসা অন্ধকার। চারিদিকে পুরু জঙ্গল, অদূরেই খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। স্থির পাহাড়, নিস্তব্ধ জঙ্গল, তারই মাঝে চঞ্চলা মূর্তি নদীর দাপাদাপি। শয়ে শয়ে বড়ো বড়ো পাথর— সেই সব পাথরের ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে, ফাঁক দিয়ে বিভিন্নভাবে বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। পাথরে বাধা পেয়ে জল ছিটকে যাচ্ছে চারিদিকে। তার থেকে গর্জন উঠছে অবিরত। ঘন জঙ্গল, বড়ো বড়ো পাথর, মূর্তি-র জল, ফেনা আর গর্জন — সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য জায়গা এই রকি আইল্যান্ড। শুনেছিলাম প্রকৃতির খুব কাছাকাছি আরও দুটো জায়গা — 'সামসিং' আর 'সানতালিখোলা'র কথা। কিন্তু দিনের আলো আর নেই। তাই আমাদের রিসর্টে ফিরতে হল। আগামীকাল সকালে বেরিয়ে যাব

‘কালিম্পং’-এর উদ্দেশ্যে। জঙ্গল থেকে এবার যাত্রা পাহাড়ের পথে।

তিস্তা নদীর ধারে ধারে ছবির মতো সুন্দর রাস্তা। তিস্তা — প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলা এক পাহাড়ি নদী, সেই তিস্তাই আবার সেবক রোডের পাশে পাশে, কালিম্পং যাওয়ার পথে, করোনেশন ব্রিজের তলা দিয়ে বয়ে চলা বিশাল এক নদী — বিপুল তার প্রস্থ। এই দুই তিস্তাকে দেখে চমক লাগে বই কী!!

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম কালিম্পং। উচ্চতা প্রায় ১২৫০ মি। খুব একটা ঠান্ডা নেই। কালিম্পং-এর আবহাওয়া নানারকম অর্কিডের জন্য আদর্শ। প্রথমেই একটা নার্সারি-তে গিয়ে ক্যাকটাস আর অর্কিডের সংগ্রহ দেখলাম। এরপর গেলাম শহর থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে অবস্থিত ‘দুরপিন দারা’ মনাস্ট্রি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। কিন্তু দুরপিন পৌঁছোনোর পরেই কোথা থেকে একঝাঁক কুয়াশা এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। কাঞ্চনজঙ্ঘা তো দূরের কথা — আশেপাশের পর্বতমালাও ভালো করে দেখা যায় কই? দ্বিতীয় দুদ্‌য়োম রিনপোচে (Dudjom Rinpoche) এই মনাস্ট্রি স্থাপন করেন ১৯৭০ সালে এবং ১৯৭৬ সালে দলাই লামা এই মনাস্ট্রি প্রতিস্থাপন করেন। মনাস্ট্রির ভিতরে গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল মূর্তি আছে। মনাস্ট্রির ভিতরের দেওয়াল জুড়ে বহু প্রাচীন পেন্টিং। এছাড়াও মনাস্ট্রির ভিতরে রাখা আছে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু দুষ্প্রাপ্য নথি ও পুঁথি। মনাস্ট্রির ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ। এখানে এলে মন অনেক শান্ত হয়ে যায়। বিকেলে গেলাম থংসা গোম্পার কাছে অবস্থিত ‘মঙ্গলধাম’, যা অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ১৯৪০ সালে গুরুজি শ্রী মঙ্গল দাসী মহারাজ কালিম্পং সফরে আসেন এবং স্থানীয় দরিদ্র মানুষদের জন্য এই মন্দির ও স্কুল নির্মাণ করেন। মঙ্গল ধামের থিম জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা। মঠের ভিতরের দেওয়াল জুড়ে চিত্রিত রয়েছে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য। সন্ধ্যাবেলায় কালিম্পং-এর স্থানীয় বাজার কিছুক্ষণ ঘুরলাম।

পরেরদিন সকালে উঠেই দেখি আকাশ মুখ ভার করে বসে আছে। কীসের অভিমান, কে জানে! ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। যাইহোক, গরম গরম মোমো সহযোগে প্রাতরাশ সেরে আমরা চললাম কালিম্পং-এর মূল শহর থেকে প্রায় ৬ কিমি দূরে অবস্থিত ‘ডেলো’ পার্কের দিকে। পাইন গাছের বাগান দিয়ে ঘেরা ‘ডেলো’ পার্ক থেকে কালিম্পং শহরের খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা হাত ধরাধরি করে আমাদের ঘিরে রেখেছিল বলে আমরা তা দেখতে পাইনি। ঘন সবুজ পাইনের বাগানের মধ্যে বসে বসে মেঘ আর কুয়াশার বিরামহীন আসাযাওয়া আর নাম না জানা পাখির ডাক বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করলাম। পাহাড়ের বুকে ধেয়ে আসা মেঘবালিকার দল মনে অন্যরকম এক অনুভূতি জাগায়। চারিদিক ধূসরতায় ঢেকে এই মেঘ যেন ভিজিয়ে দিয়ে যায় মনটাকেও। ডেলো পার্কের কাছেই রাস্তার ধারে পড়ল হনুমান মন্দির। এখানে রয়েছে ৩০ ফিট উঁচু হনুমানজির মূর্তি— যা উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মূর্তি। পাশের দুর্গা মন্দিরে তখন মহানবমীর পুজো চলছে।

ডেলো থেকে এরপর চললাম ‘রিশপ’-এর পথে। পাইনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রিশপ যাওয়ার পথ। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ — যতই এগোচ্ছি, তা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জঙ্গলের ঘনত্ব। রাস্তার দুপাশে গগনচুম্বী ঘন পাইন বন। নানা প্রজাতির ফার্নের মেলা বসেছে। চারিদিক একই রকম মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা। সুয্যি মামার দেখা নেই। তবে তিনি উদয় হলেও এই ঘন জঙ্গলে তাঁর দেখা পাওয়া ভার হত বলেই মনে হচ্ছে। রাস্তা প্রায় জনমানব শূন্য। মাঝে মধ্যে একটা-দুটো ছোটো ছোটো বাড়ি আর এক-দুজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় গাড়ির নাচনের ঠেলায় আমাদের সবারই অবস্থা ঢিলা হবার জোগাড়। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দুলকি নাচনের পর আমরা পৌছালাম রিশপে। এখানে প্যারাডাইস হোম স্টে-তে আমাদের ঘর বুক করা আছে। হোম স্টে-টা বেশ ছিমছাম। রিশপের উচ্চতা প্রায় ৮৫০০ ফিট। ঠান্ডাও জবরদস্ত। রিশপ একটা ছোট্ট শান্ত পাহাড়ি গ্রাম— প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তার মূল আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণের বেশিরভাগটাই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঘিরে। আমাদের হোম স্টে-টা পাহাড়ের ঢালের একদম গায়ে। ঘরের সামনেই বাঁশের বেড়া দেওয়া একফালি ছোট্ট বাগান, আর তারপরেই গভীর খাদ। হোম স্টে-র মালিকের মুখে শুনলাম এই বাগানে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘা-র খুব সুন্দর রূপ দেখা যায়। শুনেই আনন্দে মনটা নেচে উঠল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য — আমরা দেখতে পেলাম না। পুরো বরফের পাহাড়টাই ঢেকে আছে মেঘের তলায়। মেঘ আর পাহাড়ের ইচ্ছা না হলে পথিক দর্শন পায় না তার তুষার শুভ্রতার। আমরাও পেলাম না। কিন্তু আড়ালে তিনি আছেন। “হয়তো একটু পরেই মেঘ সরে যাবে, আর তিনি ঝিলমিলিয়ে উঠবেন তাঁর শ্বেতশুভ্র সৌন্দর্য নিয়ে” — এই ভাবনা নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম নাম না জানা পাহাড়ি ফুলে ভরা বাগানটাতে। বিকেলে রিশপ গ্রামটা হেঁটে হেঁটে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। পৌঁছে গিয়েছিলাম প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। প্রকৃতি এখানে অনেক আদিম — অনেক নির্জন। ঘন গাছগাছালির মাঝে, আলোছায়ার ফাঁকে, নানা পাখির ডাকে ঘেরা মেঠো পাহাড়ি পথে কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে বেশ লাগছিল। সন্ধ্যেবেলায় হোম স্টে-র বাগানে আগুনের চারধারে বসে রিশপে বেড়াতে আসা অন্যান্যদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেশ কেটে গেল। “কাল ভোরবেলায় হয়তো দেখা মিলবে কাঞ্চনজঙ্ঘার” — এই কথা ভাবতে ভাবতে লেপের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বেশ তাড়াতাড়িই। কিন্তু পরেরদিন ভোরবেলাতেও দেখা পেলাম না কাঞ্চনজঙ্ঘার। হতাশ যে হইনি তা নয় — কিন্তু কী পাইনি তার



Contents

হিসাব মেলাতে ইচ্ছা নেই। যা দেখেছি, যা পেয়েছি তাই বা কম কীসের।

রিশপ-কে বিদায় জানিয়ে এবার যাত্রা 'লাভা'-র উদ্দেশে। সঙ্গী আবার সেই অত্যন্ত খারাপ রাস্তা। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর শহর লাভা। উচ্চতা রিশপের থেকে কম, প্রায় ৭৫০০ ফিট। লাভার প্রধান আকর্ষণ দুটো। 'লাভা মনাস্ট্রি' আর 'ছাঙ্গি জলপ্রপাত'। জলপ্রপাত যেতে গেলে চড়াই-উতরাই ভেঙে 'নেওরা ভ্যালি ফরেস্ট'-এর ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ যেতে হয়। সেখানে আমরা যাইনি। লাভা মনাস্ট্রি খুব সুন্দর। একটা বড়ো চাতালের একদিকে মূল মনাস্ট্রি আর অন্য দিকে মস্ত বড়ো প্রেয়ার হল। দুটিরই ভিতরে গৌতম বুদ্ধের বিশাল মূর্তি। মাঝের বিশাল চাতালে দেখা গেল মঠের সন্ন্যাসী আর শিক্ষার্থীদের। মনাস্ট্রির বাইরে একটু নীচে নামলেই শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গা। পাশেই সোনালি রঙের চূড়া দেওয়া কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সুয্যি মামা উঁকি দিচ্ছিলেন, আর সেই সূর্যের আলোয় ওই স্তূপের চুড়োগুলো ঝলমল করে উঠছিল। লাভা মনাস্ট্রির বিশাল চাতালে দাঁড়িয়ে কুয়াশা আর রোদ্দুরের লুকোচুরি আর ঘন পাইনের জঙ্গলে ঘেরা চারপাশের পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম।

এবার ঘরে ফেরার পালা। ফেরার পথে 'কুয়াপানি' নামে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মোমো খেলাম। অসাধারণ স্বাদ। আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর 'ফাফরখেতি' নামে একটা জায়গায় থামলাম। আগে নাম শুনিনি। দেখে মন ভরে গেল। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা ব্রিজ— আর ব্রিজের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এক পাহাড়ি নদী অনেকটা নীচ দিয়ে পাথরে পাথরে ফেনা তুলে ছুটে চলেছে— নাম তার 'চেল'। ব্রিজটার নামও চেল ব্রিজ। আমরা গাড়ি থেকে নেমে চলে গেলাম নীচে— একেবারে নদীর কাছে। কিছুক্ষণ নদীতীরে কাটিয়ে আবার ধরলাম ফেরার পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চড়াই-উতরাই শেষ। এরপর মনোরম চা বাগানের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ চলার পর অবশেষে আবার পৌঁছোলাম নিউ মাল জংশনে। আজ রাতেই কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরব।

চারদিন ডুয়ার্সের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। নিত্যনতুন জায়গায় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড়ের কোলে সুন্দর সুন্দর থাকার জায়গা, আর স্থানীয় মানুষদের আন্তরিক ব্যবহার — সব মিলিয়ে একটা সুন্দর ছিমছাম ভ্রমণ।

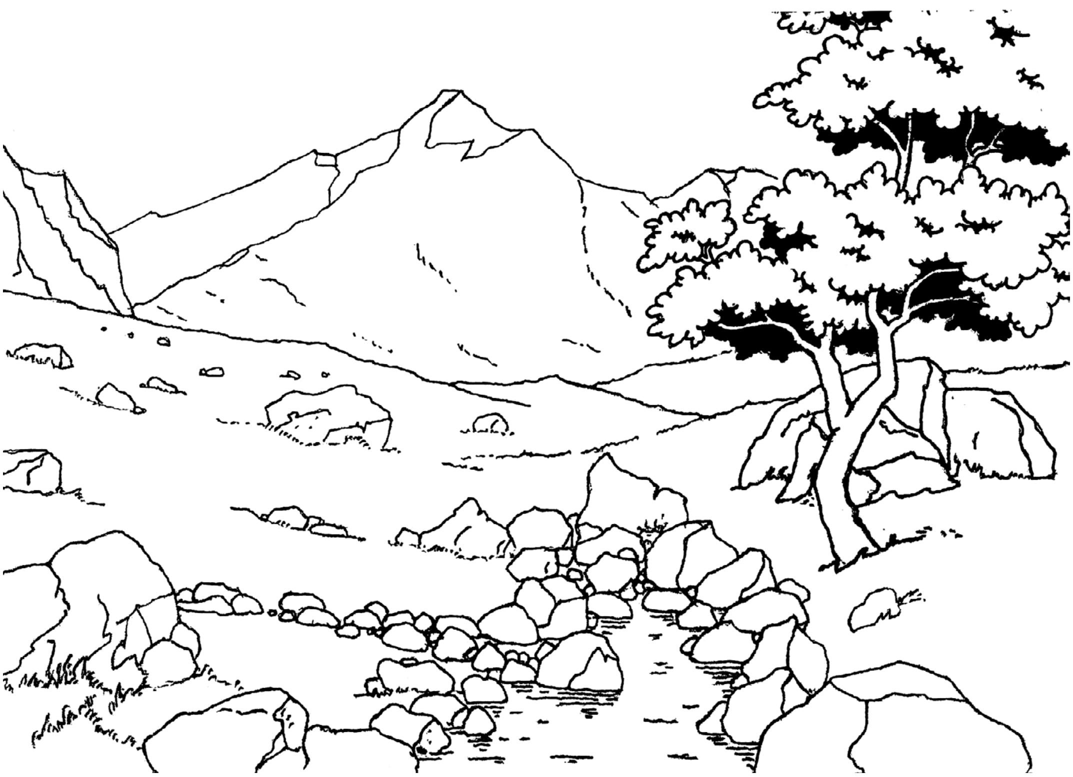

A Landscape from Herge's Album — Rahul Bandyopadhyay

# কফির দেশে দুদিন

## এক অজানা যাত্রীর ডায়েরি

সব বাঙালিই যে ঘরকুনো নয় তা বিভূতিভূষণের শঙ্কর অনেকদিন আগেই দেখিয়ে দিয়েছে। সারাদিনের ব্যস্তময় সময়ের আবদ্ধে মন চাইলেও ঘুরতে যাওয়ার ফুরসতটুকু হয়ে ওঠে না। SNBNCBSএর থোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িথোড় জীবনটার অনেকটাই রিসার্চ ল্যাব থেকে হরেনদার চায়ের দোকানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ যদি এসে যায়, সেই সুযোগ কে-ই বা ছাড়ে। দক্ষিণ ভারতে একটি কাজের ডাক পড়ল, আর কথায় বলে যে খায় চিনি, তাকে জোগায় চিন্তামণি, কাজ শেষ হতে হতে পড়ে গেল Weekend। Google Map দেখাল ব্যাঙ্গালোর থেকে মাত্র ২৫০ কিমি দূরেই পশ্চিমঘাটের কোলে অবস্থিত শৈলশহর কুর্গ, ভারতের কফিহাউস।

আর কী! কাজ সেরে শুক্রবার রাতেই চড়ে বসলাম ট্রেনে, একটা নতুন গন্তব্যের উদ্দেশে, সঙ্গী আমার দুই বন্ধু। ভোররাতেই পৌঁছালাম মহীশূর। সেখান থেকে Indian Railways অনুমোদিত টুরিজমের অফিস থেকে দুদিনের জন্যে গাড়ি বুক করা হল, শুরু হল কুর্গের উদ্দেশে যাত্রা। সবুজ বনানীর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সর্পিল রাস্তা, মাঝেমাঝে উঁকি দিচ্ছে পাহাড়। প্রতিটি কোনায় কোনায় যেন প্রকৃতিদেবী সবুজের ছোঁয়ায় মন মুগ্ধ করে রেখেছে। কথায় বলে না, "The most beautiful places are at the end of really bad roads"– কুর্গের ক্ষেত্রেও কথাটা বেশ খানিকটা প্রযোজ্য। রাস্তার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কুর্গে পৌঁছে রিসর্ট পেতে পেতে সূর্য মধ্যগগনে, পেটে ততক্ষণে ক্ষুধা দেবতা ভর করেছেন। রিসর্ট এবং তার মালিকের প্রশংসা করতেই হবে আলাদা করে, যেমন সুন্দর জায়গা, তেমনই ব্যবহার। স্নান সেরে আসতে আসতেই চলে এল গরম গরম খাবার। বেশ ভরপেট মধ্যাহ্নভোজনের পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম, প্রথম গন্তব্যস্থল পুষ্পগিরি পাহাড় ও অভয়ারণ্য। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কুর্গের সবচেয়ে সুন্দর স্থান এটাই। প্রায় দু-ঘন্টা জিপের মধ্যে রোলার কোস্টারের মতো ওঠানামা করার পর অবশেষে পৌঁছালাম অভয়ারণ্যের মধ্যে। সেখান থেকে ১৫ মিনিট ট্রেক করে পৌঁছালাম পুষ্পগিরির শৃঙ্গচূড়ায়। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য অসাধারণ। চারিদিকে মাথা তুলে আছে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের সারি, আর তার ঠিক নীচেই চিরহরিৎ পশ্চিমঘাট, "স্কটল্যান্ড অফ ইন্ডিয়া" নামটা সত্যিই সার্থক। মনের মতো করে ছবি তুলে, জিপে ফিরে এলাম আমরা, চললাম পরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি এতটাই ল্যাদখোর যে ওই বাজে রাস্তাতেও ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, যখন পরের গন্তব্যে পৌঁছালাম, তখন বিকাল শেষের পথে, প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে গেলাম অ্যাবে জলপ্রপাত। এত কষ্ট করে ট্রাইপড আনার সার্থকতা এই একটা ছবি তোলার জন্যেই।

অ্যাবে জলপ্রপাত

এর পরে বেশ দৌড়াদৌড়ি করে পৌঁছালাম সানসেট পয়েন্ট। সূর্য বাবাজি ততক্ষণে রক্তিম হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্তাচলে। এই স্থানটির সৌন্দর্যও দেখার মতন। পাহাড়ের কোলে ঝুপ করে সূর্য নামার পরেই আসতে আসতে আলোটা কমে গিয়ে একটা মোহময়ী আবহ তৈরি করে। এখানে দ্রুত অন্ধকার নেমে আসে, তাই রওনা দিলাম রিসর্টের দিকে। মাঝে বাজারে নামলাম, কিনে নিলাম কুর্গের বিখ্যাত চকোলেট আর মশলা। সেসব কিনে ব্যাগ ভর্তি করে ফিরতে ফিরতে বেজে গেল প্রায় সাড়ে আটটা, তারপর ডিনার করেই শুয়ে পড়লাম, পরের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে বলে।

পরের দিন যে এত চমক থাকবে সেটা আগে ভাবিনি। ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের জন্য নীচে যখন নামলাম, তখন আমি একটা মোহনবাগানের টিশার্ট পরেছিলাম। আচমকাই একজন বলে উঠল, "Are you from Kolkata? Do you support Mohun Bagan?" এই বিদেশ বিভুঁইয়ে যে কেউ মোহনবাগানকে চিনবে সেটা ভাবতেই পারিনি। বলাই বাহুল্য, আলাপ জমতে বেশি সময় লাগেনি। জানতে পারলাম, এই রিসর্টের মালিক উনিই, আগে আর্মিতে ছিলেন, প্রায় ১০ বছর কলকাতায় থেকেছেন, এমনকি মহামেডানের হয়ে হকিও খেলেছেন। খুবই অমায়িক মানুষ, হঠাৎ প্রস্তাব দিলেন ওনার নিজের কফি এস্টেট ঘোরাতে নিয়ে যাবেন। এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া। একেবারে হাতে ধরে উনি ওনার এস্টেট ঘোরালেন। আর আমাদের ভাগ্যটাও ছিল ভীষণ ভালো, মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল কুর্গে। যার জন্য পুরো বাগান ফুলে ফুলে ভরে গেছে, যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ বনানী আর শ্বেতশুভ্র

কফি এস্টেটের মধ্যে তোলা কফি ফুলের ছবি

কফিফুল। এই বছর নাকি বিগত কয়েক বছরের থেকে বেশি ফুল হয়েছে। শুধু কি ফুল? সবুজ লালচে রঙের কফি ফলেরও সমাহার চারিদিকে। আর আমরা হেঁটে চলেছি তার মাঝ দিয়ে, এ এক অপূর্ব অনুভূতি। এখানকার এই কফিই প্রসেসড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় লাঞ্চ সেরে আমরা রওনা দিলাম পরের গন্তব্যস্থলের জন্য, কাবেরী নিঃস্বর্গধাম। কাবেরী নদীর উপর ৫৪ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত এই দ্বীপে যেতে হয় একটি ঝুলন্ত দড়ির সেতু পেরিয়ে। ঘন বাঁশ ও চন্দন কাঠে পূর্ণ এই দ্বীপের মধ্যে আছে ডিয়ার পার্ক, পিকক পার্ক এবং আরও অনেক কিছু। এখান থেকে আমরা রওনা দিলাম দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের দিকে, আমাদের দ্বিতীয় দিনের শেষ গন্তব্যস্থল। জায়গাটি কাবেরী নদীর একদম তীরেই। আমাদের এখানে যেমন গঙ্গা, দক্ষিণ ভারতে তেমনই কাবেরী, পুণ্যতোয়া। পৌঁছে দেখলাম, প্রচুর লোক কাবেরী স্নানে ব্যস্ত। যেহেতু এই জায়গাটা কাবেরীর ব্যাকওয়াটারে ভরা, তাই বেশ কিছুদুর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায়। হাঁটুজল ভেঙে কিছুদূর গিয়ে একটা টিলার উপরে বসলাম আমরা। চারিদিকে পাখিরা কলতান করতে করতে ঘরে ফিরছে, বেশ কিছুদূরে শুনতে পাওয়া গেল হাতির ডাক। এদিকে সূর্যও আস্তে আস্তে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। আরও কিছুক্ষণ থেকে আমরা আমাদের গাড়ির দিকে আবার ফিরতে শুরু করলাম, রিসর্টে ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাতটা বেজে গেল। ফেরার পথে একটা ক্যাফেতে ঢুঁ মারলাম কুর্গের হোমমেড ফিল্টার কফি খাবার জন্য। পরদিন সকালেই বেরোতে হবে, তাই আর দেরি না করে ঘুমিয়ে গেলাম তাড়াতাড়িই। পরের দিন ভোরে উঠেই আমরা রওনা দিলাম মহীশূরের উদ্দেশে, ফেরার ট্রেন এগারোটায়। ফেরার পথে রাস্তা থেকেই ঝটিকা সফরে দেখলাম বিখ্যাত মহীশূর প্যালেস। যদিও প্যালেস রাতের বেলায় সবচেয়ে সুন্দর লাগে, যাই হোক, একটা টুরে তো সব তৃপ্তি থাকে না। পরের বার এটা হবে, এই আশা নিয়েই ফ্লাইটে চেপে বসলাম। কলকাতা ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত, SNBতে পা রাখলা ম রাত একটায়, সঙ্গে অনেক সুখস্মৃতি।

মেঘলা

Shaili Sett

# মারখা উপত্যকায় পদযাত্রা

**গুরুদাস ঘোষ**

ভ্রমণপিপাসুর কাছে লাদাখ এক স্বপ্নের দেশ। ভারতের অন্যান্য অংশের ভূপ্রকৃতি থেকে অনেকটাই আলাদা, যেন এক শীতল মরুভূমি। হিমালয়ের আরও অনেক জায়গা দেখা হলেও, লাদাখে যাওয়ার সময় ও সুযোগ ইতিপূর্বে হয়ে ওঠেনি। আমার পরিচিত ট্রেকিং ক্লাব কাঁচরাপাড়ার Association for Trekking and Ecological Awareness থেকে যখন লাদাখের মারখা উপত্যকায় ট্রেকিং-এর পরিকল্পনা করা হল, আমিও সানন্দে যোগ দিলাম। জাঁসকার নদীর এক শাখা 'মারখা' নদীর অববাহিকা বরাবর ট্রেকিং, তাই এই ট্রেকরুট 'মারখা ভ্যালি ট্রেক' নামে পরিচিত। ২০১৬ সালের ২০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর — দু সপ্তাহের ভ্রমণে মূল ট্রেকিং ৭ দিনের। অংশগ্রহণকারী নতুন এবং পুরোনো সদস্য মিলিয়ে মোট ৯ জন। ট্রেন এবং বিমানের টিকিট বুকিংও করা হল সময়মতো। ফোনে যোগাযোগ করা হল স্থানীয় ঘোড়াওয়ালা তথা পথপ্রদর্শক তাশির সঙ্গে। ঠিক হল প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘোড়া নিয়ে আমাদের যাত্রাসঙ্গী হবে। অবশেষে গোছগাছ সেরে ২০ আগস্ট হাওড়া থেকে চড়ে বসলাম কালকা মেল-এ। দু-রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে ২২ আগস্ট ভোর রাতে পৌঁছোলাম চণ্ডীগড় স্টেশনে। সেখান থেকে চণ্ডীগড় বাসস্ট্যান্ডে। মানালিগামী প্রথম বাস ভোরের আলো ফোটার আগেই ছাড়ল। পথে বার কয়েক থেমে সেই বাস যখন মানালিতে পৌঁছোল তখন বিকাল সাড়ে তিনটে।

পরিকল্পনা অনুসারে সেদিন আমাদের মানালিতে রাত্রিবাস এবং পরবর্তী দিন সকালে লে-এর উদ্দেশে যাত্রা করার কথা। মালপত্র নিয়ে হোটেলের পথে চলেছি, এমন সময় দলনেতা মৃগাঙ্কর সঙ্গে কথা হল লে থেকে আসা দুজন ড্রাইভারের সঙ্গে। দুজনে দুটো গাড়িতে লে থেকে মানালি এসেছিল যাত্রী নিয়ে, এবার ফিরে যাবে লে। আমাদেরও দুটো গাড়ি লাগবে। সুতরাং দুই ড্রাইভার এক কথায় রাজি হয়ে গেল, বাজার চলতি রেটের থেকে কম টাকাতেই। তবে সেই সঙ্গে জানাল, মানালি থেকে লে অভিমুখে গাড়ি ছাড়ে সোম, বুধ, শুক্র, অপরদিকে লে থেকে মানালির উদ্দেশে গাড়ি ছাড়ে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি। হাইওয়েতে মুখোমুখি গাড়ি এড়াতে মোটর অপারেটর্স ইউনিয়ন এই নিয়ম করেছে। দিনটা ছিল সোমবার। তাই যাত্রা শুরু করে কিছুটা এগিয়ে থাকলে আগামীকাল লে-র উদ্দেশে রওনা দিতে কোনো বাধা নেই। তাই গাড়ির ড্রাইভার দুজন চাইছিল সেদিনই রওনা হতে। দলপতি সকলের মতামত চাইল। আমরা সবাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। মানালি সকলেরই দেখা। তাই সকলেই চাইছিলাম গন্তব্যের দিকে যথাসম্ভব এগিয়ে যেতে। হোটেলে ওঠার পরিবর্তে আমরা দুটি গাড়িতে মালপত্র তুলে ফেললাম। খবর পেয়ে দেখা করতে এলেন রতনলাল বিশ্বাস, যিনি আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এবং বাঙালি পর্বতাভিযাত্রীদের কাছে এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। উনি অন্য একটি ট্রেক করতে হিমাচলে এসেছিলেন। আগামীকাল ফিরে যাবেন কলকাতার উদ্দেশে। তিনি কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং আমাদের শুভযাত্রা কামনা করলেন।

মানালি - লে সড়ক পথে অবস্থিত জনপদ কেলং

পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল ভরে নিয়ে আমাদের দুটি কোয়ালিস গাড়ি যাত্রা শুরু করল লে-র উদ্দেশে। দূরত্ব ৪৭০ কিমি। যাত্রাপথে হোটেলে একরাত কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনে পৌঁছোনো যায় লে। সড়কপথে লে যাওয়ার দুটো রাস্তা। একটা মানালি থেকে রোটাং, কেলং, বারচা লা, থাংলাং লা পেরিয়ে লে — যে পথে আমরা চলেছি। অন্য পথটি শ্রীনগর থেকে দ্রাস, জোজি লা হয়ে লে। তবে বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফের আধিক্যের জন্য অগম্য থাকে সড়কপথ। তখন বিমানই একমাত্র ভরসা। জুলাই মাস নাগাদ বরফ গলার পরে সড়কপথ গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত হয়। মানালি শহর পেরোতেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর কোনো টুরিস্ট গাড়ি চোখে পড়ছে না।

শুধু আমাদের গাড়িদুটো হেড লাইট জ্বেলে পর পর ছুটে চলেছে। আজকের গন্তব্য কেলং। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলাম পিরপঞ্জল গিরিশিরার উপরে অবস্থিত রোটাং পাস (Rohtang Pass, 3978 mt. /13051 ft.)। মানালি থেকে দূরত্ব ৫০ কিমি। ড্রাইভার ভয় পাচ্ছে, বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে পাথর পড়তে পারে। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। বৃষ্টির বিরাম নেই।পথের ধারে একটা ধাবা দেখে ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করে দিল। বলল, আজ এখানেই থাকতে হবে। কেলং আজ আর পৌঁছোনো যাবে না। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ঝাঁপখোলা একমাত্র ধাবাটিতে এসে উঠলাম। সেখানে খাবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু থাকার ব্যবস্থা নেই। দোকানের মালিক একটু পরে দোকান বন্ধ করে দেবে। আমরা দোকানদারকে বোঝালাম, আমাদের শোবার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ, ম্যাট্রেস ইত্যাদি আছে। দোকানদার বিপদে পড়ে গেল। এই দুর্যোগের রাতে তাড়িয়ে দিতেও পারছে না, আবার প্রহরাহীন দোকানে এতগুলো অপরিচিত লোককে থাকতে দিতেও দ্বিধা। ইতিমধ্যে আরও একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ধাবার সামনে। গাড়ির ড্রাইভার আমাদের দুই ড্রাইভারের পরিচিত। সে উৎসাহ দিতে আমাদের ড্রাইভার দুজনও মত পরিবর্তন করল। ঠিক হল গাড়ি কেলং পর্যন্ত যাবে। আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ কেলং পৌঁছলাম। মানালি থেকে দূরত্ব ১২৬ কিমি। উচ্চতা ৩০৮০ মিটার (১০১০৫ ফুট)। কেলং দর্শনীয় স্থান না হলেও লাহুল ও স্পিতির জেলাসদর হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। লে যাত্রীরা অনেকেই কেলং-এ রাত্রিবাস করে। সেজন্য গড়ে উঠেছে বেশ কিছু হোটেল। বাকি রাতটুকু কেলং-এর 'স্নো-ভিউ' হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। স্নান করার প্রশ্নই নেই। দেখলাম দূরে পাহাড়ের গায়ে গত রাতে নতুন করে বরফ পড়েছে।

মানালি - লে জাতীয় সড়ক

আমাদের যাত্রা শুরু হল। কেলং-এর জনপদ পেরিয়ে মানালি - লে হাইওয়ে ধরে গাড়ি দ্রুত ছুটে চলল। পাহাড় এখানে রুক্ষ। কোনো গাছপালা নেই। পাথরের রংও ভিন্ন। কখনও ধূসর, কখনও

মানালি - লে সড়কপথের সর্বোচ্চ স্থান - থাংলাং লা

গেরুয়া। পথে দেখা মেলে পণ্যবাহী ট্রাক ও মোটরবাইকের। অনেকক্ষণ চলার পরে এক একটা ধাবা। চা থেকে রাইস, পরোটা, আচার কিংবা নুড্‌লস, জলের বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রথমের কয়েকটা ধাবার স্থায়ী টিন ও কাঠের ঘর থাকলেও পরবর্তী পথের সব কটি ধাবাই অস্থায়ী তাঁবুতে। পথের পাশেই দেখলাম একটা লেক — 'ভিশাল তাল'। এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় এখানে মারা যান। তাঁর স্মৃতিতেই লেকের এই নাম। দুপুর বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম সারচু (Sirchu)। কয়েকটি ছোটো হোটেল রয়েছে। আমরা সেরে নিলাম দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। তারপর গাড়ি ছুটে চলল একই গতিতে। প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম পাং (Pang, 4657 mt. / 15280 ft.)। চা পানের বিরতি। পরিচয় হল দুজন সাইকেল যাত্রীর সঙ্গে। একজন মুম্বইয়ের, অপরজন শিলংয়ের। দুজনে দুটি সাইকেল নিয়ে লাদাখ ভ্রমণে এসেছেন। আমাদের দেখালেন তাঁদের অত্যাধুনিক সাইকেল। আমাদের গাড়ি আবার ছুটে চলল। পথের কিছু কিছু অংশ বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তা সারাইয়ের জন্য কয়েকটি রোলার, বুলডোজার চোখে পড়ল চলার পথের ধারে। কিছু সামরিক ছাউনিও নজরে এল। গাড়ি ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছোলাম সড়কপথের সর্বোচ্চ স্থান থাংলাং লা-তে (Thanglang La, 5328 mt. /17480 ft.)। কয়েকটি সামরিক তাঁবু আর প্রেয়ার ফ্ল্যাগে ঘেরা এই শিখর থেকে একদিকে দেখা যায় আমাদের ফেলে আসা পথ সাপের মতো এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে। অপরদিকে লে-গামী পথও নেমে গিয়েছে একই রকমভাবে। চতুর্দিকে দিগন্ত জুড়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বাতাসের বেগ প্রবল। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। গাড়িতে উঠে আবার চলা। মাইলস্টোনে লে শহরের দূরত্ব কমে আসছে। শহরের উপকণ্ঠে দেখা পেলাম সিন্ধু নদের। লাদাখের মরুপ্রায় অঞ্চলে মানুষের বসবাস এই সিন্ধু আর তার কয়েকটা শাখা নদীর উপর নির্ভর করেই। সিন্ধুর অববাহিকায় কিছু সবুজ গাছপালা দেখা গেল। মরুভূমির মাঝে যেন মরূদ্যান। হেমিস, খারু, পেরিয়ে মূল শহরের দিকে চলেছি। ড্রাইভার পাশে একটা প্রাচীর ঘেরা স্কুল



Contents

লে প্যালেস থেকে লে শহরের দৃশ্য

দেখিয়ে বলল — "ইয়ে রঞ্চো কা স্কুল"। স্কুলের একটা নাম নিশ্চয় আছে। কিন্তু জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'থ্রি ইডিয়েটস'-এর সুবাদে পর্যটকদের কাছে স্কুলটা নতুন পরিচিতি পেয়েছে। পথে একটা মাইলস্টোনে লেখা দেখেছিলাম — 'অল ইজ ওয়েল'। এক সময় পথের দুধারে বাড়ি, হোটেল আর আলো দেখে বুঝলাম পৌঁছে গিয়েছি লে (Leh, 3500 mt. / 11482 ft.) শহরে। মালপত্র নিয়ে 'অজন্তা লজ'-এ উঠলাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সকলেই পরিশ্রান্ত। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া গেল। পরদিন অর্থাৎ ২৪ আগস্ট সকালে লে শহরের দোকান, বাজার, লে প্যালেস ঘুরে দেখলাম। লে শহরের সর্বত্র তিব্বতি সংস্কৃতির ছাপ এখনও স্পষ্ট। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য জিংচেন যাবার জন্য দুটো গাড়ি ঠিক করা হল। ইতিমধ্যে আমাদের ঘোড়াওয়ালা তাশি এবং কুক তেনজিং চলে এসেছে। হাতে লোহার ক্যান-এ কেরোসিন তেল। দুপুরে খাওয়া সেরে বেলা তিনটের কিছু পরে আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম জিংচেন-এর পথে। লে শহর ছাড়িয়ে ধূসর পাহাড় পেরিয়ে পাকদণ্ডী পথে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। এই পথে টুরিস্ট বড়ো একটা আসে না। পিচের রাস্তা নতুন হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পরে রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঢালু পথে নেমে পড়ল। একটা পাহাড়ি নদী অতিক্রম করে গাছপালা ঘেরা একটা উদ্যানে গাড়ি থামল। এটাই জিংচেন (Zingchen, 3400 mt. / 11156 ft.) ক্যাম্পসাইট। তাশি জানাল, গতকাল এখানে বেশ কয়েকটা তাঁবু ছিল। আজ একেবারে ফাঁকা। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি দুটো ফিরে গেল। যাবার আগে ড্রাইভার সইদ বলে গেল, কাংমারু লা-র উপর থেকে ফোনের টাওয়ার ধরে। আগে জানিয়ে দিলে, যেদিন ট্রেক শেষ করে সুমদো গ্রামে পৌঁছোব, সেদিন সে গাড়ি নিয়ে আমাদের লে-তে পৌঁছে দিতে পারে। ড্রাইভারদের বিদায় জানিয়ে আমরা তাঁবু টাঙাতে শুরু করলাম। তেনজিং আর তাশি রান্নার ব্যবস্থা করতে শুরু করল। খাবার জল বলতে পার্শ্ববর্তী নালা। তাশি তার সাতটা ঘোড়া এনে তাঁবুর কাছে বেঁধে রাখল। রাতে রুটি আর ডিমের ঝোল খেয়ে আমরা যে যার স্লিপিং ব্যাগ-এ ঢুকে পড়লাম। ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং শব্দ আর নদীর জলের অবিরাম কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন থেকে শুরু হল আমাদের প্রকৃত ট্রেকিং, যার বিবরণ দিনপঞ্জির আকারে লেখা হল —

**২৫ আগস্ট ২০১৬**

আজ আমাদের পদযাত্রার প্রথম দিন। জিংচেন থেকে উরুৎসে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ। হাঁটা শুরু হল গাড়ি চলার রাস্তা ধরে। একটু পরেই প্রবেশ করলাম 'Hemis High Altitude National Park'-এ। এর পরে গাড়ি যাওয়ার কোনো উপায় নেই। শুরু হল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। কখনও নদী পেরিয়ে ওপার বরাবর হাঁটা, কখনও আবার নদী পেরিয়ে এপারে। রুক্ষ মরুভূমির মতো ভূপ্রকৃতি। বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। নদী-নালার

প্রথম দিনের যাত্রাপথ - জিংচেন থেকে উরুৎসে উদ্দেশ্য

কাছাকাছি সামান্য গাছপালা, সবুজের ছোঁয়া, দু-একটা গ্রাম, আর বাকিটা শীতল মরুভূমি। পথে কয়েকজন বিদেশির দেখা পেলাম। কিছুটা চলার পরে সাদা তাঁবুর মধ্যে একটা চায়ের দোকান দেখা গেল। জায়গার নাম রুমবক (Rumbak)। পশমের তৈরি কিছু পুতুল বিক্রির জন্য রাখা আছে। আরও কয়েকজন বিদেশি পদযাত্রী এল। চা পানের পর আবার হেঁটে চলা। প্রথম দেখায় লাদাখের সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল নানা রঙের পাহাড়। হিমালয়ের অন্যত্র রঙের এই বৈচিত্র্য দেখা যায় না। কোনো গাছপালা নেই বলেই হয়তো এই রঙের বৈচিত্র্য আরও বেশি করে চোখে পড়ে। কোথাও লাল, কোথাও হাল্কা বেগুনি, কোথাও আবার ধূসর। একটা লাল পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলতে চলতে দেখলাম, লোহার মরচের মতো ভঙ্গুর পাথর। হাতে করে ভেঙে তুলে মনে হল — এ তো পাথর নয়, এ তো লোহা! অর্থাৎ পাহাড়ের এই অংশে আকরিক লোহার ভাগই বেশি। আবার কোথাও তামার আকরিক। প্রকৃতির সম্পদে ভরপুর এই উপত্যকা। তবে দুর্গমতার জন্যই এ দিকে মানুষের নজর পড়েনি। চলার পথে এক বয়স্ক বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে দেখা হল। দু হাতে স্টিক নিয়ে হাঁটছিলেন। সৌজন্যবশত মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্তে' বললেন। আমরাও

গন্ডা লা-র পাদদেশে উরুৎসে ক্যাম্পসাইট

প্রতিনমস্কার জানালাম। রাস্তা খুবই খারাপ। পাহাড়ের ঢাল বরাবর পাথরের গুঁড়োর উপর দিয়েই সাবধানে চলা। দেখা হল অপর এক বিদেশি বৃদ্ধের সঙ্গে। নমস্কার জানিয়ে চলে যেতে যেতে শুনতে পেলাম তাঁর মৃদু স্বগতোক্তি - “I don’t like this Ladakhi trail”। অর্থাৎ সৌন্দর্যের সঙ্গে যে ভয়ংকর রূপ মিশে রয়েছে, সেটা তাঁর পছন্দ হয়নি। চলতে চলতে পথে সঙ্গী পেলাম দলপতি মৃগাঙ্ককে। ফুল, পাখি, পাহাড়ের ফটো তুলতে তুলতে চলেছে। কিছু দূরে একটা গ্রাম। কয়েকটি মাত্র বাড়ি। একটা দোতলা পাথরের বাড়ি রয়েছে। কাছে গিয়ে বুঝলাম ওটা একটা ‘হোম স্টে’। পাশেই বার্লির খেতে হলুদ রং ধরেছে। বাতাসে দুলে চলেছে অবিরাম। সেই হোম স্টে-র কেয়ারটেকারের সঙ্গে দেখা হতে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পাথরের উপরে বসলাম। সামনে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের চূড়া। কেয়ারটেকার জানাল, এইসব অঞ্চলে তুষার চিতা প্রায়ই দেখা যায়। তবে বরফ না থাকলে চিতার দল চলে যায় অন্যত্র। শীতকালে ফিরে আসে। তাদের ফটো তুলতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আধুনিক ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বিদেশিদের দল আসে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল থেকে তো প্রায়ই আসে। ওরা দূরে পাহাড়ে তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। তখন এই হোম স্টে-র কর্মীরা ওদের খাবার পৌঁছে দেয়।

মৃগাঙ্কর সঙ্গে পথ চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে এক সময় পৌঁছে গেলাম উরুৎসে (Yurutse, 4050 mt. / 13287 ft.)। আরও কয়েকটা তাঁবু টাঙানো রয়েছে। আমাদের তাঁবুগুলোও টাঙানো হল। ক্যাম্প সাইটের কাছাকাছি অনেকটা জায়গায় সবুজ ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। তাতে দেখা পেলাম হরিণ আর বুনো খরগোশের। খরগোশের গায়ের রং খয়েরি। হলুদ চোখে কালো মণি, যেন ঈগলের চোখ। ঝোপের মধ্যে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। কাছে গেলেই পালিয়ে যায়। দূরে আরও কিছুটা উপরে কয়েকটা রঙিন তাঁবু দেখা যাচ্ছে। ওই জায়গাটা গন্ডা লা-র বেসক্যাম্প বলা যেতে পারে। ওই পথেই আগামীকাল আমরা গন্ডা লা অতিক্রম করব।

## ২৬ আগস্ট ২০১৬

সকালে উঠে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের এক সহযাত্রী মানসের শরীর ভালো নেই। মাথা ঘুরছে জানাল। মৃগাঙ্ক ঘোড়াওয়ালাকে বলে রাখল, যদি প্রয়োজন হয়, একজনকে ঘোড়ার পিঠে পাস অতিক্রম করিয়ে দিতে হবে। তেনজিং (ঘোড়াওয়ালা) তাতে সম্মতি জানাল। আমরা প্রাতরাশ সেরে চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। ডানপাশে উপত্যকা ঢালু হয়ে নেমেছে। সকালের রোদ সবেমাত্র সবুজ ঝোপঝাড়ের উপর পড়েছে। দেখা যাচ্ছে খরগোশের দল। কেউ দুপায়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে।

গন্ডা লা-র পথে

কেউ ছুটে গর্তে ঢুকে পড়ছে। ধীরে ধীরে উঠে চলেছি। একটা গিরিশিরার শেষপ্রান্তে পৌঁছোনোর পর বামদিকে অন্য একটা উপত্যকা উন্মোচিত হল। পথ ঘুরে গেছে সেই দিকেই। ইতিমধ্যে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি শুরু হল। কোথাও মাথা গোঁজার কিছু নেই — না একটা পাথরের ওভারহ্যাঙ্গ, না একটা গাছ। পিঠের উপরে প্লাস্টিকের শিট ঢাকা দিয়ে হাঁটছি। কিছুটা হাঁটার পর বৃষ্টি থামল। ইতিমধ্যে আমাদের ঘোড়ার দল এসে পড়ল। পাশ কাটিয়ে চলেও গেল। বুঝলাম মানসের আর ঘোড়ার প্রয়োজন হয়নি। আমার আগে রয়েছে দুই সহযাত্রী, বাকিরা পেছনে। একটা বাঁক ঘুরতেই প্রাণান্তকর চড়াই। এই ঢাল বেয়ে উঠে গেলে গন্ডা লা (পাস)। তবে পাস এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আমাদের পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি পর্যটক চলেছে গন্ডা লা-র দিকে। তাদের পথপ্রদর্শক ও মালবাহকরা সকলেই লাদাখি।

বুঝতে পারছি ক্রমশ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। আশেপাশের পাহাড়ের শ্রেণি পেরিয়ে দৃষ্টি পৌঁছে যাচ্ছে আরও দূরে — দিগন্তে মিশে থাকা অসংখ্য পাহাড়ের দিকে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। ‘পাস’-এর নীচে কিছু ঝোপঝাড়, ঘাসপাতা ছিল, এখানে সেসব কিছু নেই। শুধুই পাথর আর পাথর। তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে ঠান্ডা হাওয়া। হাতের আল্টিমিটার ঘড়িতে উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এক সময় দেখতে পেলাম দূরে কয়েকটা প্রেয়ার ফ্ল্যাগ উড়ছে। বুঝলাম,



Contents

ট্রেকিং এর পথ

ওটাই গন্ডা লা (Ganda La, 4800 mt. / 15748 ft.)। সামান্য পথটুকু উঠতেও অনেক সময় লেগে গেল। পাস-এর মাথায় উঠে পিঠের স্যাকটা নামিয়ে বসলাম। সামনে এক বিশাল উপত্যকা। তার নীচের অংশে কিছু সবুজের চিহ্ন রয়েছে। তার পরে আবার পাহাড়ের শ্রেণি। ঠান্ডা হাওয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচতে সহযাত্রী নবীন আর মৃণাল পাথরের দেওয়ালের আড়ালে বসে রয়েছে। পাস-এর বামদিকে একটু এগোলে আরও উঁচু একটা চূড়া। সে পথেও লোক চলাচল করে তার প্রমাণ — পায়ে চলা পথের রেখা। ওই চূড়া থেকে মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় বলে গাইড পোর্টাররা অনেকে ওখানে কথা বলতে যায়। অবশ্য তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই, কলকাতার কোনো 'সিম'ই লাদাখে কাজ করে না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার নামতে শুরু করলাম। নবীন আর মৃণাল দ্রুত নেমে গেল। আমি কিছুটা ধীরে ধীরে ফটো তুলতে তুলতে চললাম। গন্ডা লা পাস থেকে নেমে এসেছি সেই বিশাল উপত্যকায়। হঠাৎ দেখলাম পথের ডানদিক থেকে একটা হরিণের দল রাস্তা পেরিয়ে বামদিকে চলে গেল। আরও একটু এগোতে দেখলাম মার্মটের দল। বড়ো বড়ো দাঁত। আকার খরগোশের মতোই। ঘাসপাতাই খাদ্য। কাছে গেলেই পালিয়ে যায়। পথে দেখা পেলাম অনেক পাখির। তাদের বৈশিষ্ট্য বাংলার দেখা পাখির সঙ্গে মেলে না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি — সামান্য সবুজের স্পর্শ যেখানে রয়েছে, সেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব। অনেকটা পথ চলার পরে একটা অস্থায়ী তাঁবুর হোটেলে দেখা পেলাম নবীন এবং মৃণালের। তিনজনে একত্রিত হয়ে বাকি সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছি। ফেলে আসা পথের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সদস্যকেই সে পথে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে অজানা এক আশঙ্কা দেখা দিল। কারও কোনো বিপদ হয়নি তো! তাঁবুতেই বসে আছি তিনজন। এগিয়ে যেতে পারছি না। এক সময় দেখলাম অপর এক সদস্য কৃষ্ণেন্দু দ্রুত নেমে আসছে। আমাদের দেখে দূর থেকে ইঙ্গিতে জানাল ঘোড়া লাগবে। কিন্তু ঘোড়া কোথায়! সে তো অনেক আগেই আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছে। হয়তো এতক্ষণে স্কিউ গ্রামে পৌঁছে গেছে। কৃষ্ণেন্দু জানাল, পাসের মাথায় ওঠার আগেই দলের সদস্য মানস অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পাসের মাথায় উঠে আর নামার মতো অবস্থায় নেই। দলনেতাসহ অন্য সদস্যরা ওখানেই অপেক্ষা করছে। আমাদের দ্রুত ঘোড়া পাঠাতে বলেছে। নিকটবর্তী সিংহ গ্রামে অনেক অনুরোধ করে এক কৃষককে রাজি করানো গেল ঘোড়া নিয়ে যেতে। সে জানাল, তার ঘোড়া পিঠে মাল নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। মানুষ বইতে পারবে কিনা বলা শক্ত। খুব বেশি হলে সে ঘোড়ায় অসুস্থ সদস্যকে সিংহ গ্রাম পর্যন্ত নামিয়ে আনতে পারে। আমরা তার শর্তে রাজি হয়ে অপেক্ষারত সহযাত্রীদের উদ্দেশে একটা চিরকুট লিখে দিয়ে তৎক্ষণাৎ স্কিউ গ্রামের দিকে রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়াওয়ালাকে আবার এখানে পাঠাতে হবে বাকি রাস্তা অসুস্থ সঙ্গীকে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যেতে।

দ্রুত পথ চলছি, তবু পথ আর শেষ হতে চায় না। কখনও নালা পেরিয়ে, কখনও নদীখাতের মধ্যে হেঁটে, আবার কখনও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ক্যামেরা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছি। ছবি তোলার সময় নেই। আমরা যখন স্কিউ (Skiu, 3400 mt. / 11155 ft.) গ্রামে পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা আসন্ন। তাঁবু খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না, কিন্তু ঘোড়াওয়ালা তাশিকে পাওয়া গেল না। এই গ্রামেই তার বাড়ি। তেনজিং জানাল, তাশি বাড়িতে গিয়েছে। সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে তেনজিংকে পাঠালাম, তাশি যেন দেরি না করে ঘোড়া নিয়ে সিংহ গ্রামে পৌঁছে যায়। এরপর তাঁবুতে বসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তাশি ঘোড়ার পিঠে অপর এক সদস্য শ্যামলদাকে নিয়ে হাজির হল। তাশি জানাল, এ দিন সিংহ গ্রামে গিয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। পথে শ্যামলদাকে পেয়ে তাকেই নিয়ে এসেছে। যদি দলের অন্য সদস্যরা অসুস্থ সঙ্গীকে নিয়ে সিংহ গ্রামে পৌঁছোয়, তাহলে রাত্রিবাস এবং খাওয়ার অসুবিধা হবে না। হোম স্টে আছে। আগামীকাল সকালে ঘোড়া নিয়ে তাশি যাবে সিংহ গ্রামে। অগত্যা আমরা চারজন নৈশভোজ সেরে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই শুয়ে পড়লাম।

## ২৭ আগস্ট ২০১৬

ভোর হতেই কয়েকজন এগিয়ে চললাম সিংহ গ্রামের দিকে। ইতিমধ্যে তাশি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটার

চলার পথে কাঠের তৈরি অস্থায়ী সেতু



Contents

পর দেখলাম দূরে কয়েকজন লোক আসছে। ঘোড়ার পিঠে মানসও রয়েছে। সকলে একসঙ্গে ফিরে এলাম স্কিউ গ্রামে ক্যাম্পের কাছে। অসুস্থতার কারণে শারীরিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবেও মানস কিছুটা ভেঙে পড়েছে। সুতরাং ওকে দ্রুত লে শহরে পাঠানো উচিত। ওখানে প্রয়োজনে ডাক্তার, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হতে পারে। তাশি জানাল, এখান থেকে সরাসরি কোনো সড়কপথ নেই। তবে কিছুদূরে একটা নদীর উপরে দড়ি টানা পুল পেরোতে পারলে তারপর সড়কপথ আছে। ফোনে কথা বলে একটা গাড়িকে আনা যেতে পারে। গ্রামের একটি বাড়ি থেকে স্যাটেলাইট ফোনে কথা বলে লে থেকে গাড়ি আনার ব্যবস্থা হল। সেই সঙ্গে স্কিউ গ্রামের এক ড্রাইভারকে রাজি করানো গেল পুল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য। ইতিমধ্যে চা, সুপ ইত্যাদি খাইয়ে মানসকে কিছুটা চাঙা করা হল। অসুস্থ সঙ্গীকে একা তো পাঠানো যায় না। অপর এক সহযাত্রী স্বপনদা জানাল, মানসের সঙ্গে সেও ফিরে যাবে লে শহরে। স্বপনদার আর ট্রেক সম্পূর্ণ করা হল না। আমরা ভারাক্রান্ত মনে বিদায় জানালাম দুই সদস্যকে। আজ স্কিউ গ্রামে আমাদের বিরতি অনিবার্য হয়ে পড়ল। আমার বাকি সাতজন সদস্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনা করে এবং স্কিউ গ্রামে ঘুরে দিন কাটালাম। বাড়ির সঙ্গে বেশ কয়েকদিন যোগাযোগ নেই। একটি বাড়িতে স্যাটেলাইট ফোন আছে জানতে পেরে সহযাত্রী গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে চললাম সেই বাড়িতে। দরজার কাছে এক বয়স্কা বাড়ির কাজ করছিলেন। তাঁর নির্দেশে একটি ঘরে ঢুকলাম। টেবিলের উপরে রাখা আছে একটি ফোন। মাটির দেওয়াল, কাঠের মেঝে। কাঠের জানলায় কাচ বসানো কপাট। একটা বড়ো পাত্রে যব জাতীয় কোনো বীজ ভেজানো আছে। গন্ধে মনে হল মদ তৈরি হচ্ছে। বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হল না। কয়েকবারের চেষ্টায় দুজনে কথা বললাম বাড়ির সঙ্গে। ফোনপর্ব সেরে টাকা দেবার জন্য বাইরে সেই বয়স্কাকে আর দেখতে পেলাম না। এদিক-ওদিক খোঁজার পরে

চলার পথে দৃশ্যমান বিস্তীর্ণ উপত্যকা

দেখি, তিনি বাড়ির পেছনে বাগানে কাজ করছেন। একে অপরের ভাষা জানি না। যেটুকু বোঝা গেল, মিনিটে তিন টাকা হিসাবে যা হয় তাই। আমরা হিসাব করে টাকা দিলাম। কোনো অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ নেই। দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতা। অথচ এই সহজ সরল ব্যাপারটাই শহুরে সভ্য সমাজে এত সরল থাকে না। রাতে তাঁবুতে লেগে পড়লাম রান্নার কাজে। তারপর খাওয়া শেষে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়া।

### ২৮ আগস্ট ২০১৬

সকালে যাত্রা শুরু হল মারখা অভিমুখে। সমস্ত পথটাই মারখা নদীকে পাশে রেখে। তবু 'মারখা' নামে খ্যাত গ্রামটিই আজকের গন্তব্য। স্কিউ গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটা শুরু হল। কিছুটা এগোতেই দেখা পেলাম এক বৃদ্ধ লামার। বয়স সত্তরের কম হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু চেহারা সুঠাম। দাঁত এখনও এত ঝক্‌ঝকে যে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন করানো যেতে পারে। অল্প ইংরেজি জানেন। আমরা কলকাতা থেকে আসছি শুনে বেশ উৎসাহিত হলেন। জানালেন, তিনিও একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন। আমরা ওঁর সঙ্গে ফটো তুলতে চাইলে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

মারখা উপত্যকা

মারখার তীর বরাবর হাঁটা। কখনও কাঠের সাঁকো পেরিয়ে নদীর পাড় পরিবর্তন। একবার জলে নেমে মারখা নদী পেরোতে হল। তীব্র ঠান্ডা স্রোত। জুতো খুলে, প্যান্ট গুটিয়ে, হাত ধরাধরি করে নদী পেরোলাম। অনেকটা হাঁটার পরে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। ঢোকার মুখে কাঠের থামে মৃত ভেড়ার সিং-সহ মাথা। একটা বোর্ডের লেখা পড়ে জানলাম জায়গাটা 'সারা-পা'। হোটেলটি চালান এক বৃদ্ধা। চায়ের সঙ্গে খেত থেকে তোলা কিছু মটরশুটি প্লেটে সাজিয়ে দিলেন। কোনোরকম সার ছাড়া উৎপন্ন সেই মিষ্টি মটরশুটির স্বাদ আজও মনে পড়ে। দোকানের পিছনের জমিতে বাঁধাকপি, টমেটোর চাষ দেখলাম। আবার এগিয়ে চলা। অনেকটা চড়াই পথের পরে ততটাই উতরাই পথ পার করে এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের দেওয়ালে প্রাকৃতিকভাবে এক গুহা সৃষ্টি হয়েছে। যেন ছোটোবেলায় ইন্দ্রজাল কমিক্‌স-এ পড়া বেতালের করোটি গুহা। কাছে এসে দেখলাম গুহার প্রবেশপথ

মারখা উপত্যকার এক গ্রাম

কিছুটা উঁচুতে। চলার পথ থেকে কিছুটা নীচে দেখলাম পাথর সাজিয়ে তৈরি করা ইঁদারার আকারের একটা বড়ো গর্ত। জানা গেল, এটা বুনো কুকুর মারার ফাঁদ। ভিতরে ছাগল বেঁধে রাখা হয়। সেই ছাগল খাবার জন্য বুনো কুকুর অথবা নেকড়ে লাফিয়ে গর্তে নামলে আর উঠতে পারে না। তখন পাথর ছুঁড়ে বুনো কুকুর বা নেকড়েকে মেরে ফেলা হয়। এখানে পাহাড়ের ঢালে প্রচুর ভেড়া, ছাগল চরে। মেষপালকদের কাছে তাই বুনো কুকুর ও নেকড়ে বড়ো শত্রু। নির্মল প্রকৃতির মাঝে এই নৃশংস ব্যাপার মন ভারাক্রান্ত করে। মারখাকে পাশে রেখে আরও অনেকটা পথ হেঁটে বিকালে পৌঁছোলাম মারখা (Markha, 3700 mt. / 12200 ft.) গ্রামে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে আমাদের তাঁবু টাঙানো হল। রাতে মৃগাঙ্ক নিজেই নেমে পড়ল রাঁধুনির ভূমিকায়।

**২৯ আগস্ট ২০১৬**

লাদাখের একটি গ্রামের কুকুর

আজকের গন্তব্য মারখা থেকে থুজুংসে। পথ চলা শুরু হল মারখা গ্রামের সবুজ খেতের মধ্যে দিয়ে। কিছুটা চলার পরে দেখলাম পাহাড়ের উপরে পাখির বাসার মতো ছোট্ট একটা মনাস্ট্রি। কে, কবে বানিয়েছিল তা জানা নেই। তবে একটা পথ খাড়া উঠে গিয়েছে সেই মনাস্ট্রির দিকে। কোনো লোকজন দেখা গেল না। মনে হল, এই অঞ্চলে যদি কখনও ভূমিকম্প হয় তাহলে ওই মনাস্ট্রির কী হবে! কিছুদূর চলার পরে পথের পাশেই একটি চায়ের দোকানে বিশ্রাম। পাশ্ববর্তী বাড়িতে এক তিব্বতি কুকুর খুব ডাকছিল। কৌতূহলী হয়ে কাছাকাছি গিয়ে দেখি কুকুরটা একটা মোটা শিকলে

টেন্ট রক

বাঁধা রয়েছে। তার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অনেক বিদেশি কুকুর দেখেছি, কিন্তু লাদাখি এই কুকুর দেখার পরে বিদেশি মোহ দূর হতে বাধ্য। সোনালি লোমে ঢাকা শরীরে সূর্যের আলো যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। চা পানের পরে আবার হাঁটা। পথ গিয়েছে একটা বড়ো জপযন্ত্রের পাশ দিয়ে। পথ থেকে সবুজের ছোঁয়া হারিয়েছে। কখনও একদিকে খাড়া পাহাড়ের ঢাল অন্যদিকে জল এবং বায়ুপ্রবাহে ক্ষয়ে যাওয়া শিলাস্তর ছোটো ছোটো চূড়ার আকার নিয়েছে। তাদের অনেকের মাথায় ব্যাঙের ছাতার মতো বড়ো বড়ো পাথর। ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে বলে Hoodoos বা Tent rock। দূরে দেখা গেল থুজুংসে (Thochuntse, 4100 mt. / 13451 ft.) ক্যাম্প সাইট। কাছাকাছি আসতে একটা মজার বিষয় লক্ষ করলাম। ছোটো ছোটো পাথরের উপরে বসে আছে ধূসর রঙের এক একটা ইঁদুর। আকারে ধেড়ে ইঁদুরের মতোই, তবে লেজ নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে গিনিপিগের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের তাঁবু যেখানে টাঙানো হল, তার আশেপাশেও প্রচুর ইঁদুর। প্রতিটা ছোটো পাথরের উপরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে

লাদাখের ইঁদুর

রয়েছে এক একটা ইঁদুর। বেশ মজার দৃশ্য। পাশে বয়ে চলেছে মারখা জলধারা। সুন্দর পরিবেশ। কাছাকাছি বেশ কিছু পাখিও চোখে পড়ল। ক্রমশ অন্ধকার গ্রাস করল উপত্যকাকে। এখানে ঠান্ডা অনেকটা বেশি। তেনজিং বেশ মজার ছেলে। কৌতুক করে জানাল, আগামীকাল নিমালিং-এর ভয়ানক ঠান্ডায় সকলের হাল খারাপ হয়ে যাবে।

### ৩০ আগস্ট ২০১৬

আজকের গন্তব্য নিমালিং অর্থাৎ কাংমারু লা-র বেস ক্যাম্প। পথ খুব দীর্ঘ না হলেও চড়াই অনেকটা। ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলা। হঠাৎ গুরুগম্ভীর শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠল। কিছুদূরে পাহাড়ে ধস নেমেছে! ধসের জায়গাটায় ধুলোর একটা মেঘ তৈরি হয়ে গেল। চলছি আর চলছি। মারখা নদী অনেক নীচে দেখা যেতে যেতে চোখের আড়ালে চলে গেল এক সময়। তার পরিবর্তে উদ্ভাসিত হতে লাগল বহু দূরের শৃঙ্গরাজি। নিকটতম শৃঙ্গ কাং ইয়াৎসের মাথায় তুষারের মুকুট ঝক্‌ঝক্ করছে। একটা ছোটো লেকও দেখলাম পথের পাশেই। চড়াই শেষ হবার পরে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কত বিশাল তা বলে বোঝানো যাবে না। চলছি তো চলছি। ইতিমধ্যে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেল। চলার গতি বাড়ালাম। নিমালিং (Nimaling, 4700 mt. / 15419 ft.)-এ যখন পৌঁছোলাম, তখন বেশ জোরে তুষারপাত হচ্ছে। ঘোড়ার

নিমালিং এর পথে

পিঠে তাঁবু পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁবু টাঙানো হল তাড়াতাড়ি করে। তুষারপাত চলল আরও কিছুক্ষণ। তাপমাত্রা নেমে গেল কয়েক ডিগ্রি। তাঁবুর মধ্যে বসে দেখলাম বিশাল সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চমরী গাই, ঘোড়া, গাধা আর কয়েকটা তিব্বতি কালো কুকুর। এই উপত্যকা থেকে একদিকে পাহাড় ক্রমশ উঁচু হয়ে মিলেছে কাংমারু লা-য়। অপর দিকেও পথ উঁচু হয়ে মিশেছে এক গিরিশিরায়, যার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে কাং ইয়াৎসে। এখান থেকে কাংমারু লা-র অবস্থান অনুমান করা যায়। কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না। তবে দূরবিনের সাহায্যে দেখা গেল কাংমারু লা-র মাথায় টাঙানো প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। রান্নার আয়োজন শুরু হল। কিচেন টেন্ট-এ খাওয়া সাঙ্গ হলে তাঁবুতে সেই যে ঢুকে পড়লাম, তারপরে প্রয়োজন হলেও কেউ আর বেরোতে রাজি নয়। তেনজিং-এর ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেল দেখছি। আগামীকাল এই ট্রেকের শেষ এবং দীর্ঘতম পদযাত্রা অপেক্ষা করে রয়েছে।

### ৩১ আগস্ট ২০১৬

আজ সেই বহু প্রত্যাশিত দিন। এই ট্রেকিং-এর উচ্চতম স্থান কাংমারু লা (Kangmaru La, 5150 mt. / 16896 ft.) অতিক্রম করতে হবে। তার পরে ক্রমাগত নেমে একই দিনে পৌঁছে যাওয়া সুমদো গ্রামে। সেখান থেকে আবার মিলবে মোটরপথ। ক্যাম্প থেকে হাঁটাপথে উপত্যকা পেরোনোর পরেই টানা দমফাটা চড়াই।

কাংমারু লা থেকে লাদাখের উপত্যকার দৃশ্য

এই চড়াই শেষ হয়েছে পাস-এর মাথায়। রুক্ষ পাথর আর নুড়ি মাড়িয়ে শুধুই উঠে যাওয়া। আমি, নবীন এবং মৃণাল এগিয়ে ছিলাম। পিছনে অপর সঙ্গীরা এবং অন্যান্য তাঁবুতে থাকা বেশ কিছু বিদেশি অভিযাত্রীও উঠে আসছে একই পথে। ঘোড়াও চড়ছে মালপত্র নিয়ে। একটু একটু করে, লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলা। দম নিতে দাঁড়িয়ে একবার নীচের দিকে দেখি, আর একবার উপরের দিকে তাকাই। ক্যাম্প থেকে পাস দেখা গেলেও, অনেকটা ওঠার পরে পাস আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পাহাড়ের ঢালের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে কাংমারু লা। অবশেষে গতকাল দূরবিনে দেখা সেই প্রেয়ার ফ্ল্যাগ নজরে আসায় উৎসাহ বাড়ল। একটু পরে সত্যিই উঠে এলাম কাংমারু লা-র উপরে। চারিদিক ভালো করে দেখে নিলাম। একদিকে লাদাখ এবং জাঁসকার রেঞ্জ, অন্যদিকে বহুদূরে দেখা যায় কারাকোরাম রেঞ্জ যার অনেকটাই পাকিস্তানের অন্তর্গত। এখান থেকে দৃশ্যমান আরও ছোটো-বড়ো কত পাহাড় তা গুনে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে কাছে তুষারমণ্ডিত কাং ইয়াৎসে শৃঙ্গ (২১০০০ ফুট) যার উপরে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অসাধারণ দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। এই চূড়ায় অভিযান হয়। ইতিমধ্যে দলের অন্য সঙ্গীরা এসে উপস্থিত হলে ক্লাবের পতাকা এবং জাতীয় পতাকা নিয়ে ফটো তোলা হল। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। আজ যে সব অভিযাত্রী এই পাস অতিক্রম করবে ইতিমধ্যে তারা

সকলেই উঠে এসেছে পাস-এর মাথায়। এ যেন এক বিশ্ব অভিযাত্রী সম্মেলন! মনে হল ব্রিটিশ, জার্মান, ফরাসি এবং আমেরিকান সংখ্যায় বেশি। অবাক করা বিষয় হল, এঁদের অনেকেই ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। এই দুর্গম পথে চলে এসেছেন সাহসে ভর করে। অথচ, নিজেদের দেশের আর কোনো মানুষকে দেখতে পেলাম না।

কাংমারু লা থেকে পার্শ্ববর্তী শৃঙ্গ কাং ইয়াৎসের দৃশ্য

বয়স্ক তো নয়ই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'বেঁচে' থাকার শিক্ষাটা এঁদের থেকে নিতেই হয়। আমাদের মালবাহক কয়েকটা ঘোড়া পাসের মাথায় উঠে মালপত্র সমেতই শুয়ে পড়ল। একটু পরে নিজেরাই (মালপত্র সমেত) উঠে দাঁড়াল। কাংমারু লা থেকেই শুধুমাত্র মোবাইল ফোন কাজ করে। নীচে নেমে গেলে আর টাওয়ার সংযোগ থাকে না। গাড়ির ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে সুমদো গ্রামে উপস্থিত থাকতে বলা হল। ঘোড়াওয়ালার কথা অনুসারে সময় জানানো হল বিকাল ৫টা।

আগন্তুক দেখে কৌতূহলী মার্মট

এবার আমাদের নামার পালা। খাড়া পথ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় কোন পথে নেমে যেতে হবে তা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নামার সময় কষ্ট কম হলেও বিপদ বেশি। ধুলো আর কাঁকরে ভরা পথ। পা হড়কালে পতন অনিবার্য। কিছুটা নামার পরে একটা পাহাড়ের ঢালে সামান্য ঘাস-জমিতে কিছু পাহাড়ি হরিণ চরতে দেখলাম। পথের পাশে রঙিন ফুল। চলতে চলতে যখনই নদীখাত পেরোতে হচ্ছে, তখনই খাড়া পথে অনেকটা নামা, আর তার পরেই চড়াই বেয়ে আবার অন্য পাড়ের পথ ধরে নেওয়া। পথের পাশেই একটা জলপ্রপাত দেখলাম। অপূর্ব পরিবেশ। জ্যোৎস্না রাতে এই জলপ্রপাতের সৌন্দর্য মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করতে পারে। চলতে চলতে ঢুকে পড়লাম নদীর গর্জে। বড়ো বড়ো বোল্ডারের পাশ দিয়ে, কখনও ছোটো ছোটো পাথরের উপর পা ফেলে জলধারাকে এড়িয়ে চলতে থাকলাম। চারপাশের পাথরের রং কোথাও লাল, কোথাও গেরুয়া। একসময় নদীখাতের মধ্যবর্তী সেই পথ শেষ হয়ে আবার ঢালু পথ শুরু হল। ক্রমশই আমরা নীচের দিকে নেমে চলেছি। সঙ্গীরা কেউ অনেকটা আগে, কেউ অনেকটা পেছনে। নিস্তব্ধ নির্জন সেই উপত্যকায় একটা বাঁক ঘুরতেই নজরে এল পাহাড়ের গায়ে একটি হরিণের দল। তাদের নিরুপদ্রব জগতে মানুষের উপস্থিতি টের পেতেই দৌড়ে পাহাড়ের অন্য ঢালে ছুটে চলল। দলের মধ্যে একটা হরিণ পা ফস্কে গড়িয়ে পড়ল। আমি রুদ্ধশ্বাসে দেখছি কী হয়! কিন্তু পতনশীল অবস্থাতেই সে পাশের একটা পাথরের উপরে লাফিয়ে চলে গেল। নীচে কিছু পাথর আর ধুলো গড়িয়ে পড়ল মাত্র।

পথের ধারে এক ঝর্না

একটা ভ্যালির মধ্যে দিয়ে পথ। অল্প অল্প গাছপালা রয়েছে। পথ প্রায় সমতল। গাড়িওয়ালাকে বলা হয়েছিল পাঁচটার সময় 'সুমদো'তে অপেক্ষা করতে। আমাদের দেখা না পেলে ফিরে যেতেই পারে। ফোনে যোগাযোগও সম্ভব নয়। তাই দ্রুত হাঁটছি। পায়ের নীচে সাদা বালি। আশেপাশে তিন-চার ফুট উঁচু নাম না জানা গাছের জঙ্গল। দূরে দেখা পেলাম অগ্রবর্তী দুই সঙ্গী নবীন আর মৃণালের। শুধু তাই নয়, দূরে কিছুটা উপরে একটা মোটরপথ দেখা যাচ্ছে, আরও আনন্দের কথা, সেখানে অপেক্ষমাণ দুটো সাদা গাড়ি। অনুমান করতে অসুবিধা হল না, আমরা সুমদো (Sumdo, 3800 mt. / 12467 ft.) গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছি। অর্থাৎ আমাদের ট্রেক এখানেই শেষ হল। কিছুটা চড়াই ভেঙে গাড়ির কাছে পৌঁছোলাম। সূর্যের আলো তখন অস্তমিত। বাকি সঙ্গীদের অপেক্ষায় অন্ধকার হয়ে এল। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পরে

কাং মারু লা থেকে পথ গিয়েছ সুমদো গ্রামের দিকে

দুশ্চিন্তার অবসান হল। সকলেই শ্রান্ত দেহে উপস্থিত হল। গাড়ি যখন ছাড়ল তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। ড্রাইভার পূর্বপরিচিত সইদ এবং অপরজন তাঁরই পরিচিত। ওঁদের ভদ্রতার তুলনা হয় না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য কোনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেননি অথবা অতিরিক্ত টাকা দাবি করেননি। পথ খুবই খারাপ। গাড়ি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল। হেডলাইটের আলোয় গাছপালা, পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা হেমিসের কাছাকাছি এসে লে হাইওয়েতে উঠলাম। অজন্তা হোটেল থেকে ফোন পেলাম। জানতে চাইছিল রাতে আমরা খাব কিনা। প্রায় দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম অজন্তা হোটেলে। ট্রেকিং-এর জিনিসপত্র নিয়ে পূর্বপরিচিত সেই ঘরগুলোতেই উঠলাম। স্বপনদা এবং মানসের সঙ্গে পুনর্মিলন হল। ট্রেকিং-এর শুরুতে ভাবা হয়েছিল, ১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আগামীকাল সকলে প্যাংগং লেক দেখতে যাব। কিন্তু স্কিউ-তে একদিন অতিরিক্ত বিশ্রামের ফলে হাতে অবশিষ্ট রয়েছে একটি মাত্র দিন। এই দীর্ঘ ট্রেকিং-এর পরে আমাদের শরীর এবং পোশাকের যা অবস্থা তাকে ভদ্রসমাজের উপযুক্ত করে তুলতেও একটা দিন প্রয়োজন। ২ তারিখ সকালে দিল্লির ফ্লাইট। সুতরাং আগামীকাল প্যাংগং লেক দেখার পরিকল্পনা বাতিল হল।

### ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সকালে উঠে ধুলোর আবরণ থেকে জুতোজোড়ার স্বরূপ পুনরুদ্ধার করলাম। শেভ করে, স্নান করে নতুন পোশাক পরে লে শহর ঘুরতে বেরোলাম। ট্রেকিং-এর পরে কিছু রেশন অবশিষ্ট ছিল। তা দিয়ে দুপুরের লাঞ্চ তৈরি হল হোটেলের মধ্যেই এপ্রিকট আর আপেলে ঘেরা বাগানে। গাছ থেকে যতখুশি এপ্রিকট খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তবে আপেল এখনও কাঁচা। বিকালে মল-এ ঘুরে, কিছু কেনাকাটা করে সময় কাটল। একটা দোকান থেকে কিছু আখরোট কিনেছিলাম। পথের এক গর্দভশাবককে সাধ করে একটু খেতেও দিয়েছিলাম। সে আর পিছু ছাড়ে না। শাকসবজি তো অনেকেই খেয়েছে, তবে আখরোটের স্বাদের কাছে সে সব কিছু না। আমি 'আর নেই' বলে খালি হাত দেখালেও সে ঠিকই অনুমান করেছে পকেটে আরও আখরোট আছে। কে বলে গাধার বুদ্ধি কম! আরও কিছু আখরোট খেয়ে তবে পিছু ছাড়ল। হোটেলে ফিরে গোছগাছ করে নেওয়া হল যাবতীয় জিনিসপত্র। হোটেলের পোষা গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুরটি কিছু সময় আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল। সে আবার টমেটো খেতে খুব ভালোবাসে। রাতে সকলে একসঙ্গে পাশ্ববর্তী হোটেলে ডিনার করলাম। এ যাত্রায় লাদাখে এটাই শেষ রাত্রিবাস।

### ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সকালে নির্ধারিত সময়েই গাড়ি নিয়ে হাজির হল সইদ ভাই। চললাম লে এয়ারপোর্টের দিকে। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল, থেমেও গেল। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ড্রাইভারদের বিদায় জানিয়ে আমরা সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্য এগিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ছোটো বাসে করে গিয়ে 'গো এয়ার'-এর বিমানে উঠে বসলাম। রানওয়ে বেশ ছোটো। তার মধ্যেই উড়ল আমাদের বিমান। নীচে দেখতে পেলাম লে শহর, সেই হাইওয়ে, বাড়িঘর, সিন্ধু নদ আর অসংখ্য পাহাড়। যে পথ আমরা কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় অতিক্রম করেছিলাম, তা কয়েক মিনিটে পেরিয়ে চলে গেলাম মেঘের দেশে। মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলতে চলতে মেঘের ফাঁকে দেখা দিচ্ছিল তুষারশুভ্র অসংখ্য শৃঙ্গ ও হিমবাহ। পাখির চোখে দেখা গেল হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য।

লে এয়ারপোর্ট

এর পরবর্তী ঘটনার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের বিমান সফর সেরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেখান থেকে রেল স্টেশন। নিকটবর্তী একটি হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে উঠে পড়লাম পূর্বা এক্সপ্রেসে। ট্রেনে একরাত কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর পৌঁছে গেলাম কলকাতায়। আবার ফিরে এলাম শহরের কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রায়। দুচোখে তখনও ভাসছে লাদাখের পাহাড়, মারখা নদী, ঘোড়া, হরিণ, খরগোশ, ইঁদুর আর মার্মটের দল। জানি না কেমন আছে তারা।



Contents

# Sports Activities in the Centre

The primary idea of the current magazine *Sutra* is to weave the beads, the various creative facets of the members of this centre, into a common string. This string aspires to uphold the culture that we nurture here, and mirror it to ourselves in the quest of further betterment. While it is no surprise that academia is an integral part of our lives, and we also nurture literary aspects in ourselves, our cultural architecture is incomplete other than the various sports activities that we take part here. These sports activities are chiefly organized by the *Muktangan Sports Wing*, which is jointly coordinated by Sk. Imadul Islam and Surya Narayan Panda, and patronized by the respected Director Sir and the Registrar Madam.

We regularly take part in sports like Football, Cricket, Table Tennis, Badminton, and Carrom in the Centre. Moreover, intra-institute tournaments for the above mentioned sports are also conducted annually by the sports wing. A summary of the outcomes of the tournaments for the session 2017–2018 are enlisted below. Besides these regular activities, the closing ceremony of the year-long celebration of the 125$^{th}$ Birth Anniversary of Professor Satyendra Nath Bose was dignified by the sports wing through *Bose-125 Marathon*, a 5 km marathon commenced at Salt Lake on 31$^{st}$ December, 2018. The sports wing also desires to organize inter-institute tournaments in near future, and to include Chess in our sports activities.

The sports wing was able to conduct various activities smoothly because of the generous support of the administrative and the gardening staffs of our centre. The wing thanks Siddhartha Chatterjee, Supriyo Ganguly, Amitava Palit, Swarup Dutta, and Suvendu Dutta for their kind cooperation. The wing also expresses its sincere gratitude to Narayan Mondal and his team members for preparing and maintaining the playground for us. Finally, the sports wing would also like to thank the coordinators of the *SNB Students*, and moreover, to all the members of this centre for making the events successful.

## Outcomes of the intra-institute tournaments for the session 2017-18

### *SNB Cricket Tournament – 14$^{th}$ January, 2018*

**Champion Team** – W. G. Disgrace

**Members** – Abhishek Roy (C), Rakesh Das, Ejaj Tarif, Surya Narayan Panda, Subhasish Chakrabarty, Sk. Imadul Islam, Anirban Bhattacharya, Sudip Das, Dhiraj Tapader, Sudipta Pattanayak, Neeraj Kumar, Darshan Kumar, Ganesh Singh

**Runner up Team** – Chota Bheem

**Members** – Subrata Ghosh (C), Samiran Chowdhury, Debasish Das Mahanta, Souvanik Talukdar, Dipanjan Maity, Subrata Dev, Anuj Kumar Dhiman, Pritam Bag, Md. Sarowar Hossain, Tuhin Kumar Maji, Soumyadip Dey, Shuvankar Halder, Riju Pal

**Best Batsman** – Rakesh Das

**Best Bowler** – Ejaj Tarif

**Best Fielder** – Pritam Bag

**Man of the Tournament** – Rakesh Das

**Emerging Player** – Shubham Purwar

***SNB Carrom Tournament – 6th -7th December, 2017***

**Singles Champion** – Abhishek Roy

**Singles Runner up** – Sk. Imadul Islam

**Black finisher (Singles)** – Abhishek Roy

**Man of the Tournament (Singles)** – Sk. Imadul Islam

**Doubles Champion** – Md. Sarowar Hossain and Debabrata Ghorai

**Doubles Runner up** – Vidyasagar Manna and Arindam Ghosh

**Man of the Tournament (Doubles)** –Vidyasagar Manna

***SNB Badminton Tournament – 9th-10th January, 2018***

**Champion Team Members** – Samiran Chowdhury (C), Nirnay Samanta, Sourav Sahoo, Ankan Pandey, Sk. Imadul Islam, Krishnendu Pal, Mahebub Alam, Sudip Majumder, Neeraj Kumar

**Runner up Team Members** – Debasish Das Mahanta (C), Kartik Samanta, Avinash Kumar Chaurasiya, Subhadip Chakraborti, Sayantan Adak, Anuj Kumar Dhiman, Aslam Parvej, Md. Sarowar Hossain, Anupam Gorai.

**Joint Emerging Players** – Sayantan Adak, Saikat Pal, and Surya Narayan Panda

**Player of the Tournament** – Debasish Das Mahanta

***SNB Table Tennis Tournament – 3rd-4th April, 2018***

**Singles Champion** – Kartik Adhikari

**Singles Runner up** – Rahul Bandyopadhyay

**Singles Second Runner up** – Santanu Pan

**Doubles Champion** – Kartik Adhikari and Santanu Pan

**Doubles Runner up** – Keshab Karmakar and Sudipta Pattanayak

**Player of the Tournament** – Rahul Bandyopadhyay

[Report prepared by the Editorial Board.]

Contents

# Cultural Activities in the Centre

S. N. Bose National Centre for Basic Sciences is a famous research organization in India which was established to honour Prof. Satyendra Nath Bose, the great physicist. The scholars and researchers of this organization are dedicated to various research works to enrich the level of contribution in the field of basic sciences. Apart from this, they are talented enough to carry out various cultural activities which not only give them pleasure, but also enlighten their souls within. These cultural activities are harnessed by a common platform, named *Muktangan*. The literal meaning of *Muktangan* is an open field which encourages various activities. The Centre indeed adopted this meaning, and it practically upholds its members to engage themselves in various activities.

Every year, a cultural union is organized by *Muktangan*, called 'Bose Fest'. Bose Fest, 2018, was organized during 08th -10th February. On the first two days of the fest, oral and poster presentations were given by the students. On the second day, a cultural evening was organized, where famous musical band *Surajit o Bondhura* performed. On the third day of the fest, *Alumni Day* was organized in the centre for the first time, where former students of the centre gathered and shared their experiences. The day ended with a cultural programme. It started with soulful recitation by Anjan Barman. Following that, a duet song was presented by Koustuv Dutta and Anwesha Chakraborty, accompanied by Parushottam Majhi on keyboard and Sayan Kumar Pal on guitar. Shaili Sett presented a song performance accompanied by Ransell D'Souza playing the guitar. A dance-drama, based on fusion of classical and contemporary music was presented by Subhamita Sengupta, supported by

Jayita Patwari on narration, Arindam Ghosh on keyboard, Krishnendu Pal on background projection and Tuhin Kumar Maji on stage lighting. *SNB Khaja Band*, an amateur musical band comprising the students of the Centre mesmerized us by their group performances. The lead vocalists of the band were Chaitrali Sengupta, Md. Sarowar Hossain, Subrata Dev and Subhadip Chakraborti, accompanied by Rajkumar Sadhu and Ransell D'Souza on guitar, Debasish Das Mahanta on tabla, dhol, and cajon, Sk. Imadul Islam on tambourine, Sandip Saha on harmonica and Md. Sarowar Hossain on harmonium. A drama named *Golmele Golak*, inspired by the comedy drama *Subarna Golak* of Bankim Chandra

Chattopadhyay, was played by Sutapa Basu, Mitali Bose, Sadhana Tiwari, Suvodip Mukherjee, Bijoy Pramanik, Jayita Patwari, Tuhin Kumar Maji, Aniruddha Adhikari, Prakash Das, Kartik Das, Motilal Das, Biswanath Das, and Rupam Porel. The event was concluded with a dance performance, by Subhamita Sengupta, Dhiraj Tapader, Anupam Gorai, Swarnali Hait, Anagha Kamath, Shaili Sett, Neeraj Kumar, Darshan Kumar, Sucheta Mondal and Juriti Rajbangshi, based on fusion of various Indian languages, which essentially potrayed the unity in diversity in this country. The entire event was anchored by Shashank Gupta and Anwesha Chakraborty.

Centre observed *Swachchata Pakhwada* during 1st - 15th May, 2018, and on this occasion members presented a drama highlighting the importance of cleanliness at work place.

Many cultural programmes were organized during the *Hindi Mahina* September 2018. On the occasion of the *Hindi Diwas* on 14th September, Chaitrali Sengupta sang a melodious ghazal, Nivedita Pan and Ankita Rojariya recited poems, and Mitali Bose presented a Rabindra Sangeet. Emphasizing on the issue of bribery, Debasish Mitra played a self-authored drama associated by Mitali Bose. On 28th September, members played a comedy drama *Yamraaj Ki Dharti Yatra*. This drama, written by Sadhana Tiwari, illuminated the problems of the modern-day fast lifestyle. The performers of this drama were Sutapa Basu, Mitali Bose, Sonali Sen, Lina Chatterjee, Sadhana Tiwari, Bijoy Pramanik, Jayita Patwari, Shashank Gupta, Surya Narayan Panda, Nivedita Pan, Swarnali Hait, Tribhuban Parida, Anupam Gorai, Motilal Das, and Rupam Porel.

The Center organized an international conference on complex and functional materials during 13th -16th December, 2018 at 'Biswa Bangla Convention Center', Kolkata. On this occasion, a cultural programme was organized by the members of the Centre. Kabiguru Rabindra Nath Tagore's creation *Pujarini* was presented through dance and music. The poem was recited by Jayita Patwari, and Anulekha De, Sucheta Mondal, Arundhati Adhikari, Swarnali Hait presented the dance, which was choreographed by Subhamita Sengupta. Anupam Gorai was on stage lighting. In this event, Sayantani Dasgupta, a well known singer in Kolkata, performed classical vocal music.

Hope this journey will be continued by the future members of this Center.

[Report prepared by the Editorial Board.]

# Paintings, Drawings & Photographs

Greetings on Blackboard — Krishnendu Pal

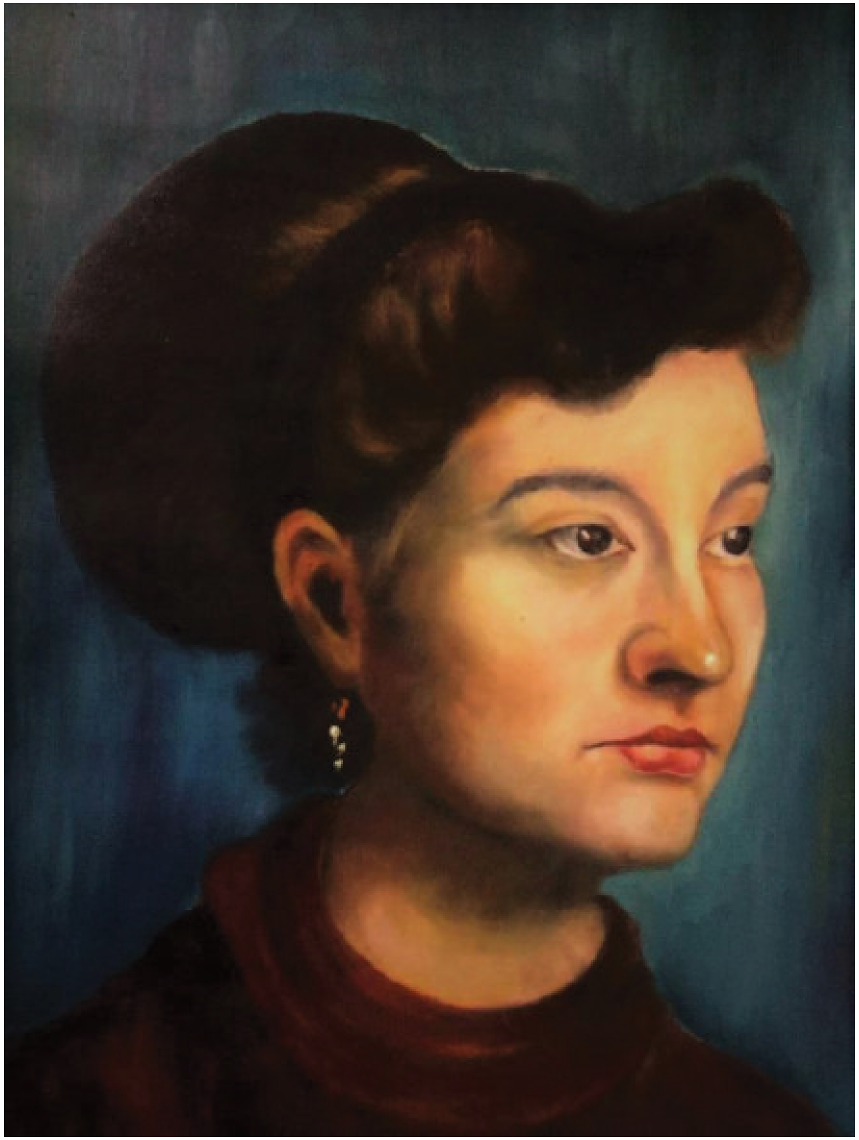

Alice [ Inspired by Degas ] Anwesha Chakraborty

“....কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলসপায়ে .....” Susmita Dey



Contents

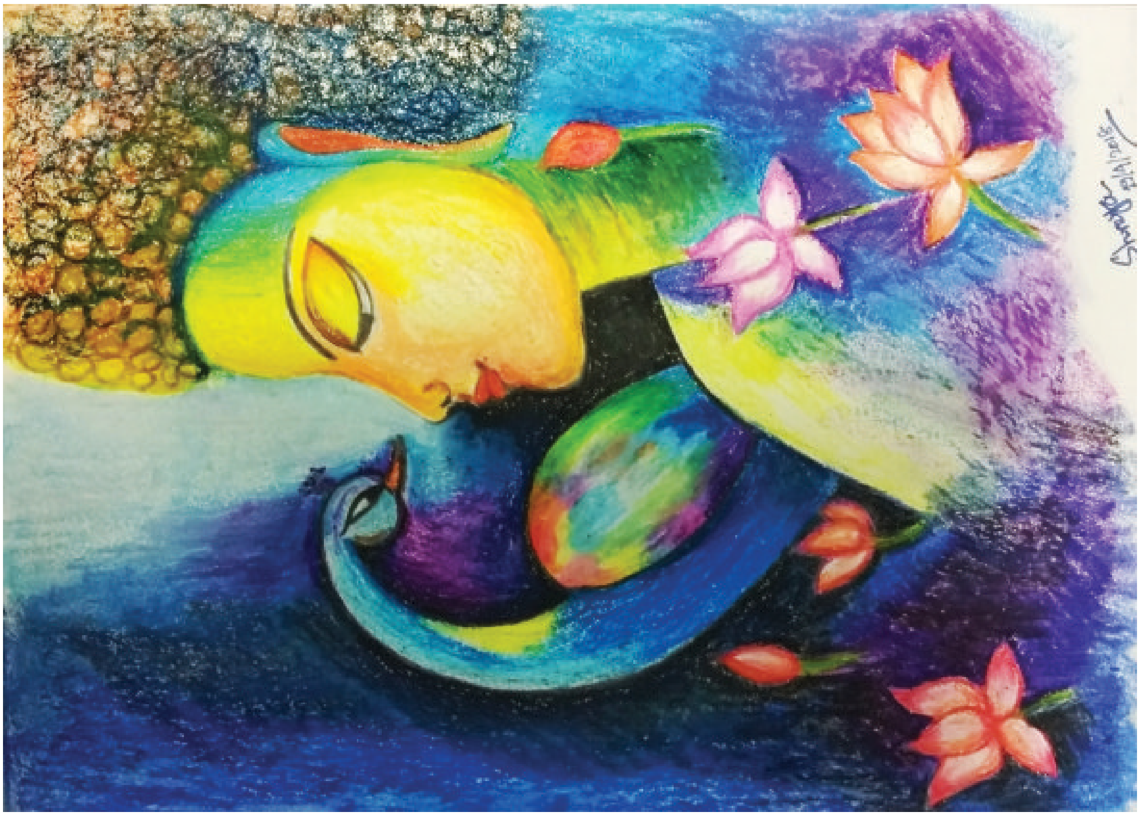

স্থিতী
Shreya Das

মোহন বাঁশি বাজে
Shreya Das

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, An unknown place in Maharastra" Tuhin Kumar Maji

Frozen Anwesha Chakraborty

Architecture Anwesha Chakraborty

Sun and Shade Subhamita Sengupta

Reflection – Mandarmani Sea Beach Samrat Ghosh

View from Mukteshwar Temple Samrat Ghosh

The Lost Glory Sunish Deb

“চোখ বোজা পাখিটাই তার মাপ নেয় ঝিমুতে ঝিমুতে, আমরা দেখি না।” – আবুল হোসেন Dhiraj Tapader

Flower Shower Koustuv Dutta

"...तमसो मा ज्योतिर्गमय..." Tuhin Kumar Maji



Contents

# Crossword

**Rupam Porel**

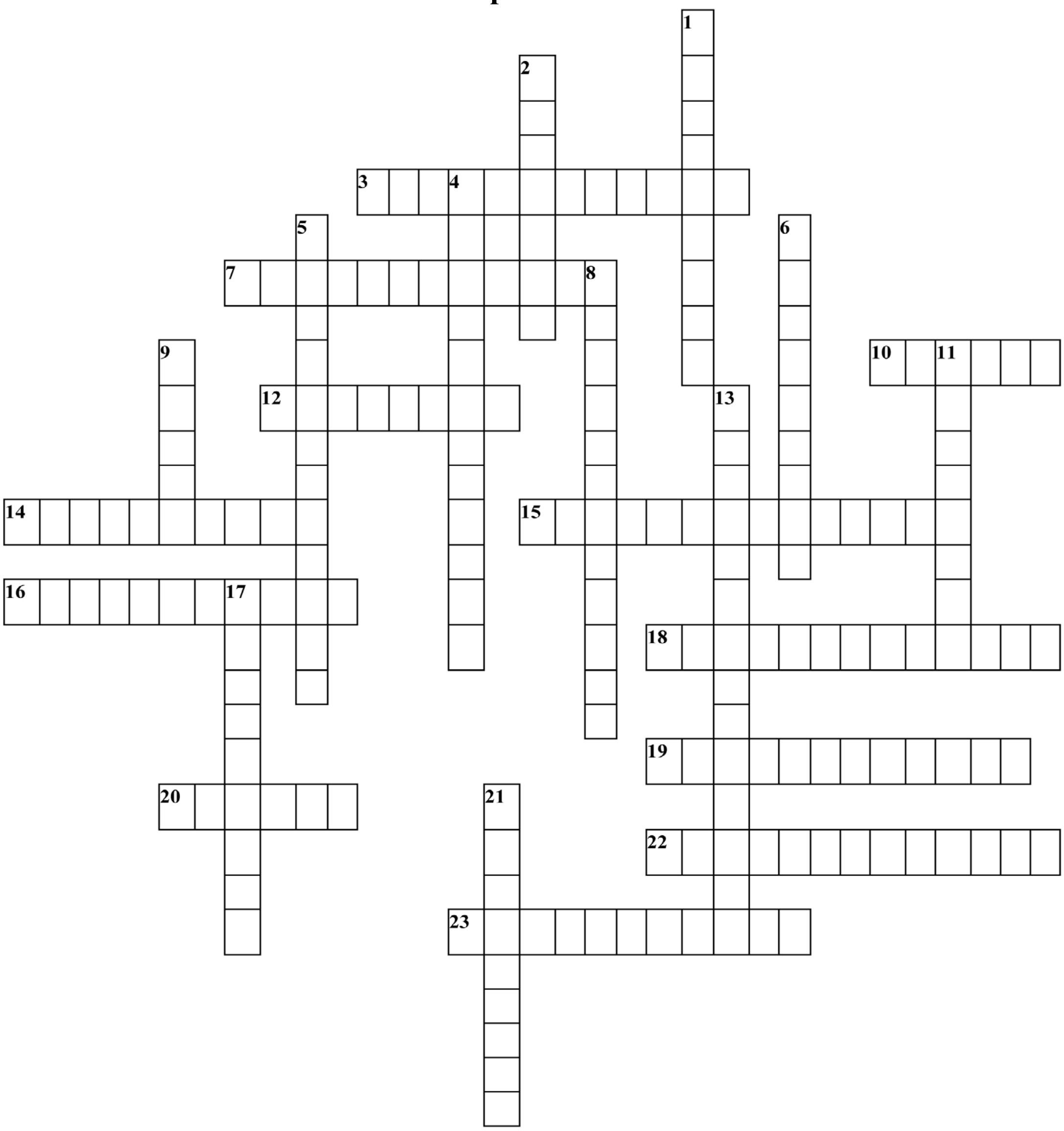


## Across

3. A regular solid figure with twelve equal pentagonal faces
7. In communication, technique whereby two or more independent messages or information-bearing signals are carried by a single common medium or channel

## Down

1 This Galaxy, cataloged as M31 and NGC 224, the closest large galaxy to the Milky Way and the only one visible to the naked eye in the Northern Hemisphere
2. It is one of two pigments found in human skin and hair and adds brown to skin color



Contents

### Across

10. In astronomy, one of the 39 known moons or natural satellites of Jupiter
12. A link to a URL stored on a computer so that the user may easily access it
14. This Vitamin helps to activate certain light-sensitive cells in the retina of the eye that synchronize the animal's daily biological rhythms with the solar light/darkness cycle
15. The use of mathematical, statistical and computer methods to analyze biological, biochemical, and biophysical data
16. Similarity of crystal structure between two or more distinct substances of minerals
18. The human ________________ system is made up of the skin, hair, nails, and associated glands
19. A ____________ makes maps from information gathered during a survey
20. The metabolic pathway of the light-independent stage of photosynthesis, which occurs in the stroma of the chloroplasts, is called _________ cycle
22. Tendency of liquid helium below a temperature of 2.19°K to flow freely, even upward, with little apparent friction
23. In plants and certain algae, the sexual phase (or an individual representing the phase) in the alternation of generations

### Down

4. Device for detecting electric charge invented by Nollet
5. The conversion of glucose to glycogen, which is stimulated by insulin from the pancreas
6. The knowledge gathered by this field of science is important to forensic science as a tool for the analysis of human remains at old crime scenes, mass graves, and mass disaster areas
8. Instrument used to determine the presence, direction, and strength of an electric current in a conductor
9. The generic name for a family of high-level languages of great significance in the development of computing
11. Device whose resistance to electric current depends on the position of some mechanical element or control in the device
13. It is a family of laboratory techniques for separating mixtures of chemicals into their individual compounds
17. Study of the groups of specialized cells called tissues that are found in most multicellular plants and animals
21. An organic phosphorus compound used as a pesticide

**Solution:**

**Across**

3. Dodecahedron
7. Multiplexing
10. Europa
12. Bookmark
14. Riboflavin
15. Bioinformatics
16. Isomorphism
18. Integumentary
19. Cartographer
20. Calvin
22. Superfluidity
23. Gametophyte

**Down**

1. Andromeda
2. Melanin
4. Electroscope
5. Glycogenesis
6. Taphonomy
8. Galvanometer
9. Algol
11. Rheostat
13. Chromatography
17. Histology
21. Parathion



Contents

# *From Bose's Desk*

‘The invitation of our Vice Chancellor is thus almost a command and I obey him with very great pleasure. But what to say on an occasion like the present? Words of advice would perhaps be deemed out of place – an infliction – and nowhere would they go far into young minds! I have, therefore, decided to narrate before my young friends bits of past history: of this University as it then was – when as fresh graduates, as they are now, we had ventured on a long and arduous trek in search of knowledge. Few had cared to traverse this unknown road before them. They had many hurdles to cross; they had numerous failures to contend with. But there were also a few successes which encouraged them for still further efforts. Luckily, the old difficulties have now almost disappeared. But the story may be interesting; it will enable you to compare the old days, with the present and I confess outright before my friends that they go out now very much better equipped for their lives' work than we were when we set out quite ill-equipped for our ambitious journey ...’

[S N Bose's address at the Convocation – 1962, University of Calcutta]

Satyendranath Bose                Suraka Bhattacharjee

A Student-Staff Initiative [ The Literary Arts Group of *Muktangan* ]

**S N Bose National Centre for Basic Sciences**

**Block–JD, Sector –III, Salt Lake, Kolkata - 700106, Email:** magazine.snbncbs@gmail.com